বনভূমির গান

অজাতশত্রু

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ :
অগ্রহায়ণ '৫৯ / নভেম্বর '৫২

প্রকাশিকা :
লতিকা সাহা / মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
জি. শীল / ইম্প্রেসন প্রবলেম
২৭এ, তারক চ্যাটার্জী লেন, কলকাতা-৭০০০০৫

শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ সরকার

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ভালুকের মতো ধূসর পাহাড়ের গায়ে থেমে গেল দলটা।

না, ঠিক পাহাড়ের গায়ে নয়। পাহাড় আর সমতলভূমির মাঝখানে ছোট একটা পাহাড়ি নদী বয়ে চলেছে তার পাড়ে এসে থামল।

আনমনা হয়ে হাঁটতে-হাঁটতে আগে এসে পড়েছেন প্রদোষ চৌধুরী।

নদীর ওপারে একফালি ফাঁকা জমি পাড় বরাবর ঢেউ খেলে পাহাড়ের গায়ে গিয়ে ঠেকেছে। তারপর আমলকীগাছের জঙ্গল—সে জঙ্গল দিগন্তের দিকে এগিয়ে রামগড়ের অরণ্যে গিয়ে ঠেকেছে তারপর পালামৌর সীমানায়।

নদীর দিকে তাকালেন প্রদোষ চৌধুরী—তিরতিরে একটা জলের স্রোত নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। জল-ভেজা সোঁদা একটা গন্ধ বাতাসের গায় ভর দিয়ে ইতি-উতি ভেসে বেড়াচ্ছে।

হেমন্তের আমলকীবনের পাতা-পত্তরে রোদ একেবারে মুছে যায় নি তখনও। ভীরু একটা ছায়া হরিণের মতো গাছের গোড়ায় ঘাপটি মেরে আছে।

নদীর ধারে এসে থমকে গেলেন প্রদোষ চৌধুরী। দূরবীনটা চোখে লাগিয়ে সামনের জঙ্গলের পলকা অন্ধকারটা তন্নতন্ন করে পরখ করে নিলেন। তার ভুরু কুঁচকে গেল। দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁটটা কামড়ে ধরলেন। মনে হল, এরই মধ্যে কোথায় যেন বাঘ-বাঘিনীর আস্তানা।

নদীর কিনারায় অসংখ্য জানোয়ারের পায়ের ছাপ।

জলের ধারে নেমে গেলেন প্রদোষ চৌধুরী। একবার ওপারে যাওয়া দরকার। শ্যাওলা জমে পিছল হয়ে আছে পাথর। পার হওয়া কঠিন।

জলের ধারে দাঁড়িয়ে দেখলেন প্রদোষ চৌধুরী। রাতে যারা জল খেতে আসে তাদের পায়ের ছাপ ছড়িয়ে আছে চারদিকে। সম্বর চিতল চিতা শুয়োর আর বনের সেই ভয়ঙ্কর রাজার পায়ের ছাপ।

উঁচু এক টুকরো পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে চারদিক দেখতে লাগলেন প্রদোষ চৌধুরী। তাজা সব পায়ের ছাপ। হয়তো আজ রাতেই ওদের সঙ্গে দেখা হবে।

বর্ষার মরশুমের আগে থেকেই একটা বাঘিনী দারুণ উৎপাত শুরু করেছে। বরহি থেকে হাজারিবাগ পর্যন্ত তার এলাকা। কখনো পালামৌর ওদিকেও হানা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন গ্রামবাসী কাঠুরে আর চাষী তার পেটে গেছে। এলাকা জুড়ে দারুণ ত্রাস নেমে এসেছে। স্থানীয় মানুষরা সরকারের কাছে আবেদন করছিল। প্রশাসনিক তৎপরতায় নামজাদা কয়েকজন শিকারি বাঘটোকে মারবার ব্যর্থ চেষ্টায় হাজারিবাগ বরহি আর পালামৌর জঙ্গলের প্রান্ত কয়েকবার ঘুরে গেছে।

এসব ব্যাপার ঘটেছিল বর্ষার আগে।

ইতিমধ্যে বর্ষা এসে পড়ল আর এবারের বর্ষার দাপটও ছিল বেশি। এই পাহাড়ি এলাকায় এখানে-সেখানে মরা সোতায় বান ডেকেছিল। বৃষ্টির সেই দিনগুলোতে বাঘিনী কোথায় যেন ডুব দিয়েছিল। তারপর বর্ষার মেঘ কেটে রোদ উঠতে পাহাড়ি সোতাগুলো যখন শুকিয়ে এল তখনই আবার বাঘিনী এই এলাকায় হানা দিয়েছে।

এই কয়েক দিন আগে জঙ্গলের ভেতরে ঝর্ণার ধারে মাহাতোদের গ্রাম থেকে একটা যুবতী মেয়েকে ধরে নিয়ে গেছে। ব্যাপারটা দিনের বেলাতে সকলের চোখের সামনে ঘটেছিল।

গাঁয়ের লোক জুটে-পুটে গিয়ে মেয়েটাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল। পারে নি।

তারপরও আর একটা ঘটনা ঘটে গেছে।

তিন-চার দিন আগে একটা দেহাতি লোক এক বোঝা কাঠ নিয়ে

আমলকী বনের কাছে অন্ধকার পেরিয়ে হাজারিবাগ রোডের ওপর এসে উঠেছিল। তখন সন্ধে হয়-হয়। সেই সময় বাঘিনী হানা দিয়ে লোকটাকে মুখে তুলে নিয়ে গেছে।

রাঁচি-হাজারিবাগ বাস রুটের এক ড্রাইভার দূর থেকে বাসে বসে ব্যাপারটা দেখে; সে-ই শহরে পৌঁছে থানায় খবরটা দিয়ে গেছে।

তারপর থেকে সরকারি-বেসরকারী তরফে জোর তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে বাঘিনীকে মারবার জন্যে।

এসব ব্যাপার প্রদোষ চৌধুরীর ঠিক মতো জানা ছিল না। তিনি হাজারিবাগ শহরে এসেছিলেন ব্যক্তিগত প্রয়োজনে। সেখানেই ফরেষ্ট রেঞ্জার বিনয় কাঞ্জিলালের সঙ্গে দেখা। আলাপ হল তার স্ত্রী মণিকা কাঞ্জিলালের সঙ্গে। আগুনের শিখার মতো চমকে উঠেছিল মণিকার মুখ।

প্রদোষ চৌধুরী মণিকার মুখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে বিনয়ের দিকে তাকালেন। তার থেকে তিন-চার বছরের বড়ো বিনয়। সবে পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে। এরই মধ্যে যেন বার্ধক্য তার ছাপ ফেলেছে বিনয়ের মুখে। দেখে প্রথমে চিনতে পারেন নি প্রদোষ চৌধুরী।

বিনয় কাঞ্জিলালই এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, প্রদোষ না? বিনয়ের দিকে তাকিয়ে অপরিচয়ের ঘোর কাটতে জড়িয়ে ধরলেন প্রদোষ চৌধুরী, আরে বিনয় তুই! কদ্দিন বাদে দেখা—!

তা অনেকদিন বাদে। সেই-সেবার কোডার্মায় তোমার ওখানে উঠেছিলাম তারপর আর দেখা হয়নি। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলাটির দিকে হাত দেখিয়ে বিনয় বললেন, এই-যে আমার মিসেস—একটু থেমে বললেন, মণিকা আমার বন্ধু প্রদোষ। বিনয় কিছুতেই ছাড়লেন না প্রদোষকে। টেনে নিয়ে গেলেন নিজের কোয়ার্টার্সে। সেখানে বসে কথা প্রসঙ্গে বিনয় তার এলাকায় বাঘের উৎপাতের কথা বলছিলেন। তারপরই জিজ্ঞাসা করলেন, যাবে নাকি আমার সঙ্গে?

কোথায়?

পরশু নাগাদ জঙ্গলে বেরুচ্ছি বাঘের হদিশে—শিকারে তোমার অরুচি নেই বলে জানি—

হেসেছিলেন প্রদোষ চৌধুরী, তা নেই—

মণিকাও সঙ্গে যাবো বলছিল। তুমি সঙ্গে থাকলে সাহস পাবো।

তারপর তোড়জোড় করে জঙ্গলে আসা।

এতক্ষণে বিনয় এসে পাহাড়ের কাছে দাঁড়ালেন, হ্যাল্লো প্রদোষ—

অন্যমনস্ক ছিলেন প্রদোষ চৌধুরী তবু সাড়া দিলেন, উ—

সন্দেহজনক কিছু ?

দূরবীনটা কাঁধে ঝুলিয়ে উপরে উঠে এলেন প্রদোষ চৌধুরী, নো—নাথিং—শুধু জায়গাটা একটু খুঁটিয়ে দেখছিলাম—। মোজায় গোঁজা পাইপটা হাতে তুলে দে'শালাইয়ের কাঠি দিয়ে খোঁচাতে খোঁচাতে বললেন, তাঁবু ফেলার পক্ষে জায়গাটা কেমন মনে হচ্ছে তোমার ?

—ওয়ানণ্ডারফুল। উচ্ছ্বাসটা বিনয়ের চোখের লেন্সে ধরা পড়ল।

প্রদোষ বুড়ো আঙুল দিয়ে পাইপের তামাকে চাপ দিয়ে হাতের কাঠিটা দে'শালাইয়ের বাক্সের গায় ছোঁয়াতেই এক ঝলক হলুদ আলো চমকে উঠল। আগুনটা তামাকে ঠেকিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, জঙ্গলের একটা চার্ম আছে রাত না হলে বোঝা যায় না; যতোবার জঙ্গলে আসি অদ্ভুত একটা অনুভব আমাকে জড়িয়ে ধরে। আকাশ-ছোঁয়া শাল-সেগুনের বনে ভয় যেন দশ দিক থেকে হামাগুড়ি দিয়ে ছুঁতে আসে!

গাছপালার ওপাশে পাহাড়ের ঘাড়ের ওপর রক্তাক্ত সূর্য যেন আহত সম্বরের মতো পড়ে আছে।

বিনয় কাঞ্জিলালের পাশে এসে দাঁড়ালেন প্রদোষ চৌধুরী, চমৎকার স্পট্ জায়গাটা শিকারের পক্ষে আদর্শ!

বনভূমির অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছে। জোয়ারের জলের মতো

অন্ধকার মুহূর্তে-মুহূর্তে একাকার করে দিচ্ছে পাহাড়-অরণ্য। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে বনে অন্ধকার নামার মায়াবী ছবি দেখেন প্রদোষ চৌধুরী।

মাইলের পর মাইল বিস্তার্ণ বনভূমির ভিতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে অন্ধকার। মহেঞ্জোদারোর দ্রাবিড়-পুরুষের মতো তার মুখের পরিলিখন। আকাশ-পাহাড়-অরণ্য জুড়ে তার অবয়ব। বসুন্ধরার আত্মায় বুঝি ঘুম-পাড়ানি গানের নির্জন লাবণ্য বুলিয়ে দিচ্ছে। কতদূর থেকে ভেসে-আসা সেই গানের সুর এই পাহাড়ি নদীর গানের স্তিমিত সৌরভের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। অরণ্যের পাতায়-পল্লবে এখন আলুলায়িত এক আবেশ। চারদিকে ছড়ানো—এই নিসর্গ সংসারকে নিথর সম্মোহ বুঝি পাহাড়ি চিতির মতো পাকে-পাকে বেঁধে ফেলেছে।

বিনয় একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন, সন্ধে হয়ে গেল নাকি!

ভয় কি হে, আমরা তো তাঁবুর কাছাকাছি আছি।

ন্-না-না, আমি সে কথা বলছি না।

তবে? হেসে বিনয়ের দিকে ফিরলেন প্রদোষ চৌধুরী।

বলছিলাম—। একটু বুঝি দ্বিধা বিনয়ের গলায়, মিসেস অনেকক্ষণ একলা আছেন।

আর তাকে এসে বাঘে ধরে নিয়ে যাবে। হো-হো করে হেসে ওঠেন প্রদোষ না কি বলো চৌধুরী?

সে কথা নয় হে প্রদোষ। বলছিলাম, ওর তো জঙ্গলে এই প্রথম—

মাঝপথে বাধা দিলেন প্রদোষ, তুমি একেবারে উচ্ছন্নে গেছ—

হাসলেন বিনয়, কি যে বলো ব্রাদার!

নাঃ, তুমি ভাবিয়ে তুললে বিনয়। তোমার মত জবরদস্ত রেঞ্জার বিরহের ধকলে একেবারে কাবু! তুমি দেখছি মেঘদূতের সেই ছোকড়া-যক্ষের চেয়েও সরেশ। তার তবু মাস খানেক লেগেছিল হাতের বালা খসে পড়তে—তোমার অবস্থা দেখছি প্রহর খানেকের ধাক্কাতেই অস্থির!

একটু বুঝি লজ্জা পেলেন বিনয় কাঞ্জিলাল, আঃ চৌধুরী থামো—

দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে সুরু করেন। সামনেই তাঁবু।

প্রদোষ চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে অবাক হলেন বিনয় কাঞ্জিলাল, হাসছো যে।

এমনি! অন্ধকারে পাইপের আগুনে রহস্যময় হয়ে উঠেছে প্রদোষ চৌধুরীর মুখের হাসি।

তোমাদের মতো কনফার্মড্ ব্যাচিলরদের এসব তত্ত্ব বোঝানো মুশকিল। চিরটা কাল নোঙর-ছেড়া নৌকোর মতো ভেসে বেড়ালে—

নদী থেকে খানিক দূরে প্রকাণ্ড একটা অর্জ্জুন গাছের ছায়ায় তাঁবু পড়েছে পাঁচ-ছটা। সঙ্গে লটবহর। লোকজনও অঢেল।

পাশ দিয়ে চলে গেছে রাঁচি-হাজারিবাগ রোড। অজগর সাপের মতো পথটা রামগড় পাহাড়ের উপর দিয়ে গড়িয়ে এসে হাজারিবাগ শহরে গিয়ে ঠেকেছে। রামগড় ক্যান্টনমেন্ট থেকে হাজারিবাগ শহর অবধি যোলো মাইল শাল সিসু আর আমলকীর অরণ্যরাজ্য—জনবিরল বিচিত্র এক ভূখণ্ড। পাহাড়ের পর পাহাড় ঢেউ খেলে নেমে গেছে শহরের দিকে। মাঝে-মাঝে পাহাড় থেকে নেমে আসা নদীর মুক্তোমালা।

আজ ক'দিন নরখাদক বাঘের সন্ধানে বেরিয়ে রেঞ্জার বিনয় কাঞ্জিলাল আর কোডার্মার মাইকা মাইনার প্রদোষ চৌধুরী রামগড় ক্যান্টনমেন্ট রোড থেকে সরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে নেমে এসেছেন।

তাঁবুর কাছে পৌঁছে প্রদোষ চৌধুরী একবার পিছন ফিরে জঙ্গলের দিকে তাকালেন; পাহাড় আর পাহাড়তলির জঙ্গল আমলকী বনের সঙ্গে অন্ধকারে মিশে গেছে। এখন আর আলাদা করবার উপায় নেই। সেই কবন্ধ অন্ধকারের চোখ মাঝে-মাঝে জোনাকির ফসফরাসে দপদপ করে জ্বলে উঠছে।

বিনয়। কি ভেবে যেন ডাকলেন প্রদোষ চৌধুরী। সাড়া না পেয়ে ফিরে দেখেন বিনয় তার তাঁবুর দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেছেন।

একটুখানি বিষণ্ণতা তাকে বুঝি আচ্ছন্ন করতে চায় ; সে কেবল মুহূর্তের জন্যে পরক্ষণেই নিজের নিঃসঙ্গ অনুভবকে ঝেড়ে ফেলে তাঁবুর দরজার দিকে এগিয়ে হাঁক দিলেন, বেয়ারা—।

নভেম্বর মাসের রাতের প্রথম প্রহর।

শীত হঠাৎ বুঝি ঘুম ভেঙে হাই তুলছে।

এ বছর বর্ষার দাপট ছিল বেশি তাই বোধহয় তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা নামতে আরম্ভ করেছে।

কুলিরা তাঁবুর সামনে কাঠ-কুটো জোগাড় করে আগুন জ্বেলেছে। শীতের চেয়ে বুনো জানোয়ারের ভয়ই তাদের বেশি।

নিজের তাঁবুর দিকে এগোতে গিয়ে তাঁবুর পিছন দিকে খাড়া হয়ে-ওঠা পাহাড়টার গা বেয়ে চোখদুটোকে আকাশে ঠেকালেন প্রদোষ চৌধুরী। ঠিক চুড়োটার মাথার ওপর চিরকালের রূপসা শুকতারা জ্বল-জ্বল করছে।

মিসেস কাঞ্জিলালের জাপানি কুকুরটার ডাক শোনা যাচ্ছে।

অন্ধকার বেশ ঘন হয়ে এসেছে। শীতের চিনচিনে বাতাস এসে গায় লাগছে। বনভূমির শরীরের অশ্চর্য মেদুর একটা গন্ধ বাতাসে আলুথালু।

জঙ্গলে জানোয়ারদের চলাফেরা সুরু হয়ে গেছে। গুলবাঘা ভালুক দাঁতাল শুয়োর সম্বর এখন তাদের ডেরার বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

হঠাৎ সম্বরের ডাক শুনে তাঁবুর বাইরে থেমে গেলেন প্রদোষ চৌধুরী। তার একটা আওয়াজ পাহাড়ের গায় ধাক্কা খেয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। বোধ হয় ভয়ের কিছু দেখেছে তাই সতর্ক করে দিচ্ছে জানোয়ারদের। একটু সময় দাঁড়িয়ে তাঁবুর পর্দা তুলে ভেতরে ঢুকে গেলেন প্রদোষ চৌধুরী। পেট্রোম্যাক্সের ঝকঝকে আলোর নিচে গা এলিয়ে বসতে বেয়ারা চা নিয়ে এল। সাব চায়—

হাত বাড়িয়ে দিলেন প্রদোষ। সারাদিন ধকলের পর এক কাপ চায়ের স্পৃহা এখন অত্যন্ত প্রবল।

অনেকক্ষণ তারিয়ে-তারিয়ে চা খেলেন প্রদোষ চৌধুরী। মনের মধ্যে ছোট্ট একটা ইচ্ছে—ছোট্ট একটা ফুলের মতো দক্ষিণের বাতাসে দুলছে।

চা শেষ করে চোখ বুঁজে রইলেন প্রদোষ চৌধুরী।

শীতের বাতাস এক-একবার পথ ভুলে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ছে। অনেকক্ষণ বাদে উঠে প্রদোষ চৌধুরী নিজের অজান্তে বিনয় কাঞ্জিলালের তাঁবুর দিকে এগোলেন।

সাদর অভ্যর্থনা অপেক্ষা করছিল বিনয় কাঞ্জিলালের তাঁবুতে।

এসো প্রদোষ, তোমার কথাই মণিকাকে বলছিলাম—চিতলটাকে যখন গুলি করলে, গুলি লাগার পরও সেটা পাহাড়ের উপর দিকে ছুটে গেল। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, মিস্‌ড্‌! তুমি হেঁকে উঠলে, নো—নেভার। তারপরই দেখলাম, চিতলটা আছড়ে পড়ল নিচে। লক্ষ্য বেধে আমিও বড়ো কম যাই না। তবু তোমার আজকের টারগেটে হিট্‌ করা আমাকে আশ্চর্য করেছে।

মণিকা এতক্ষণ কথা বলে নি। এবার তার চোখের গভীর কালোয় এক ঝাক বিস্ময়ের মেঘ এনে বলল, আচ্ছা মিস্টার চৌধুরী জঙ্গলে একলা ঘুরতে আপনার ভয় করে না?

ভয়! এবার প্রদোষ চৌধুরী মণিকাকে একবার অপলক দেখে নিলেন, তা' একটু করতো বৈকি আগে। সকলেরই করে। তখন জঙ্গলকে চিনতাম না। বন্ধুত্ব তেমন হয়ে ওঠেনি। এখন সে-ই খবর জোগায় কোথায় শত্রু ওৎ পেতে আছে।

ও মা, তাই আবার হয় নাকি! মণিকা কাঞ্জিলালের গালে টোল খায়।

সত্যি তাই হয়। পাউচ্‌ থেকে পাইপের মুখে তামাক গুঁজে দিতে-দিতে প্রদোষ চৌধুরী বলেন, যারা জঙ্গলকে চেনে না তারাই ভয়

পায়। যারা চেনে যারা জানে জঙ্গল তাদের ভয় দেয় না ভালোবাসা দেয়। আর সে ভালোবাসা সুন্দরীর ভালোবাসার চেয়ে কম মদির নয়।

গলা ছেড়ে হেসে ওঠেন বিনয় কাঞ্জিলাল। তোমার কথা বলার ধরনটা বেশ অদ্ভুত প্রদোষ।

মণিকা কাঞ্জিলালের কুকুর ন্যানসি কোথা থেকে ছুটে এসে তার পায়ের ফাঁকে মাথা গলিয়ে কুঁই কুঁই শব্দ করে।

বিরক্ত হয়ে মণিকা কাঞ্জিলাল বলেন, ন্যানসি—যাও—ওদিকে যাও— ন্যানসি অবাধ্য একগুঁয়েমিতে মাথা গুজে কুঁই কুঁই শব্দ করতে থাকে।

বড্ড জ্বালাস তুই!

প্রদোষ চৌধুরী এগিয়ে গিয়ে কুকুরটাকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, বেচারির দোষ নেই। ওর পক্ষে মারাত্মক কোন জানোয়ার তাঁবুর আশেপাশে এসে হাজির হয়েছে। গন্ধে সেই খবর জানতে পেরে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে আপনার কাছে গিয়ে হাজির হয়েছিল। নিন, ওকে কোলে নিয়ে সাহস জোগান।

ন্যানসিকে মণিকার কোলে দিয়ে প্রদোষ চৌধুরী একটা চেয়ার টেনে বিনয় কাঞ্জিলালের কাছে গিয়ে বসে পাইপে আগুন দিলেন। ব্রাণ্ডিতে ভেজানো ফাইন্-কাট্ তামাকের বাসে বাতাস ভরে উঠল, বিনয়—

কি বলবে বলে ফেল প্রদোষ।

ভাবছি, কাল সকালে পাহাড়ের গায় লেপটে-থাকা জঙ্গলটায় একবার ঢু মারবো। যাবে নাকি?

কখন?

সাতটা সাড়ে-সাতটা নাগাদ।

হেসে উঠলেন মণিকা, তবেই হয়েছে।

বিনয় কাঞ্জিলাল মণিকার দিকে তাকালেন।

অত সকালে তো লোকজন উঠবে না চৌধুরী সাহেব। চা-টা কখন পাঠাবো?

চা খেতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। হাসলেন প্রদোষ চৌধুরী, বরং এক ফ্লাস্ক চা পাঠালে—

প্রদোষ চৌধুরীর কথা শেষ হবার আগে ন্যানসি মণিকার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে কুঁই-কুঁই করে চেঁচাতে লাগল।

আঃ ন্যানসি, এবার তোকে ছুঁড়ে ফেলে দেব বাইরে।

হঠাৎ রাত্রির অন্ধকার ভেঙে-চুরে চিৎকার করে উঠল, ঘের্—ঘের্—

পীচব্লেণ্ডের মতো নিরেট অন্ধকারের এক জায়গায় ক্ষতচিহ্নের মতো আগুন জ্বলছে। সেখানে ছুটে গেলেন প্রদোষ চৌধুরী।

কুলিদের তাঁবুর সামনে দারুণ চেঁচামেচি লেগে গেছে। ভয়ে তারা কাঁপছে।

প্রদোষ চৌধুরী সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে একজন বলল, হুজুর তাঁবুর দরজার কাছে বসে আমি তামাক খাচ্ছিলাম আর কয়েকজন রান্নার কাজে ছিল। মাঝে-মাঝে উঠে গিয়ে কাঠের আগুন উসকে দিচ্ছিলাম। সেই সময় হঠাৎ দেখি রাস্তার দিককার জঙ্গল থেকে জানোয়ারটার মাথা বেরিয়ে আসছে। হুজুর আমরা জঙ্গলের মানুষ। ভয় পেলে আমাদের চলে না। তবু পঁচিশ-তিরিশ গজ দূরে অত বড় দুষমনটাকে দেখে সত্যি ভয় পেয়ে গেছিলাম। একটু দম নিয়ে লোকটা বলল, যারা রান্না করছিল হয়তো তাদের কারো ওপর ঝাপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিল তার আগেই আমি আগুন থেকে এক টুকরো জলন্ত কাঠ তুলে তার দিকে ছুঁড়ে মারলাম—অন্ধকারে মিলিয়ে গেল জানোয়ারটা।

বিনয় কাঞ্জিলাল ইতিমধ্যে রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। সন্ত্রস্ত ভিড়ের মধ্যে লোকটা তাকে সেলাম করে বলল, জী সরকার শের নিকলা—

স্ট্রেঞ্জ! স্বগতোক্তির মতো শব্দটা উচ্চারণ করে বিনয় কাঞ্জিলাল প্রদোষ চৌধুরীর পাশে এসে দাঁড়ালেন।

এদিক-ওদিক টর্চের আলো ফোকাস করতে ব্যাপারটা ধরা

পড়ল। জঙ্গলের সেই ভয়ঙ্কর আততায়ীর পায়ের ছাপ পড়েছে মাটিতে। শুকনো মাটিতে গভীরভাবে বসে যায়নি বটে তবে স্পষ্ট।

কি ব্যাপার চৌধুরী ?

বুঝতে পারছি না। চিন্তিত মনে হয় প্রদোষ চৌধুরীকে।

চিতলের মাংসের লোভে এসেছিল বোধ হয়।

প্রদোষ চৌধুরী মিসেস কাঞ্জিলালের চোখের রহস্যময় আয়নায় চোখ ফেলে মৃদু হেসে বললেন, মিসেস কাঞ্জিলাল, আমাদের কারো মাংসেই ওর লোভ কম নয়!

রাগ করবেন না চৌধুরী সাহেব। আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। কিছু বোধ হয় বলতে যাচ্ছিলেন প্রদোষ চৌধুরী। তার আগেই বিনয় কাঞ্জিলাল সরস ভঙ্গীতে বললেন, সি ইজ্ সিলি।

ন্যানসি বাইরে থাকতে চাইছে না। তাঁবুর ভেতরে যাবার জন্যে ছটফট করছে।

ন্যানসির দিকে তাকিয়ে প্রদোষ চৌধুরী বললেন, ন্যানসির হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে জঙ্গলের রাজা কাছাকাছি থাকলেও থাকতে পারে।

হয়তো আমাদের ওপর নজর রেখেছে। বিড়বিড় করেন বিনয় কাঞ্জিলাল।

কথাটা কানে গেছিল প্রদোষ চৌধুরীর, ঠিক বুঝতে পারছি না। আমরা বোধ হয় ওর আসা-যাওয়ার পথের ওপর তাঁবু ফেলেছি। মানুষখেকো না-হলে বাঘের এতখানি কৌতূহল দেখা যায় না। যাই হোক সাবধানে থাকতে হবে বিনয়।

সবাইকে সতর্ক করে দিচ্ছি।

আমি তাহলে যাচ্ছি বিনয়। তাঁবুর দিকে যেতে-যেতে প্রদোষ চৌধুরীর মনে হল, আজ রাতে হয়তো বনের রাজার সঙ্গে দেখা হতে পারে।

তাঁবুতে ফিরে রাইফেলটা হাতের কাছে রেখে দরজার দিকে মুখ করে বসলেন প্রদোষ চৌধুরী।

বিনয় কাঞ্জিলালের তাঁবু থেকে মিষ্টি একটা গানের সুর ভেসে আসছে। দড়িতে ঝোলান হ্যারিকেনের মৃদু আলোয় ফিকে অন্ধকারে বসে তাঁবুর ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। নীলচে জোছনায় বনভূমি অলৌকিক! পাহাড়ী নদীর জলের তিরতিরে শব্দ গাছের ছায়ায় পথ হারিয়ে ফেলছে বুঝি!

সারাদিন বনে-বনে ঘোরার ক্লান্তিতে শরীর যেন ভেঙে পড়ছে। না, ঘুমোলে চলবে না!

বেয়ারা খাবার রেখে গেল।

খাওয়া শেষ করে ক্যাম্পখাটে গা এলিয়ে দিলেন প্রদোষ চৌধুরী। একটু ঝিমিয়ে উঠে সারা রাত জঙ্গলের ওপর চোখ রাখবেন।

অথচ শোবার পরই মৃত্যুর মতো নিথর ঘুমে তাঁর চোখ ভরে এল।

হ্যারিকেনটা জ্বলতে লাগল।

কতক্ষণ পরে কে জানে। মণিকা কাঞ্জিলালকে নিয়ে মধুর একটা অবৈধ স্বপ্ন তাকে জড়িয়ে ধরল।

বনভূমির কোথায় যেন অপরিচিত উপত্যকা ফুলে ভরে উঠেছে। সিলোইজিনি অর্কিডের গন্ধ বাতাসে।

পঁচিশ বছর আগেকার প্রদোষ চৌধুরী কিশোরী মণিকার হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পৃথিবী সেখানে কী আশ্চর্য! নিভৃতে ফোটা ফুলের দল সেই স্নিগ্ধ নির্জনতায় কী সুন্দর! সুন্দরী ঝর্ণার হাত ধরে উপত্যকা মাটিতে নেমে এসেছে।

হলুদ একটা প্রজাপতি বাতাসে পাল তুলে পাতার আড়াল থেকে ভেসে এল।

মণিকা বললেন, এই—

সাড়া দিলেন প্রদোষ, কি ?

প্রজাপতিটাকে ধরে দিতে পারো না ?

চলো না দুজনে ধরি—। হাসেন প্রদোষ।

তারপর দুজনে উপত্যকার গা-বেয়ে দ্রুত পায় নামতে থাকেন। হঠাৎ পা পিছলে নিচের দিকে গড়িয়ে পড়তে লাগলেন প্রদোষ চৌধুরী।

—এই ধরো—ধরো আমার হাত। প্রদোষের চিৎকার ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনিতে কথা বলে উঠল।

বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মণিকা।

উত্তেজনায় ঘুম ভেঙে গেল প্রদোষের। মনের মধ্যে একটা অপরাধ বোধ স্বপ্নটাকে ঘিরে খচ্‌খচ্‌ করতে থাকে।

হঠাৎ মনে হল তাঁবুর ক্যাম্বিসে কিসের যেন আঁচড়ানোর খসখস শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। অরণ্যের বিরল একটা গন্ধ হাওয়ায় ভেসে এল। স্প্রিংয়ের মতো চমকে উঠে বন্দুক টেনে নিলেন প্রদোষ চৌধুরী।

হ্যারিকেনটা জ্বলছে।

সেদিকে তাকিয়ে বুকের স্পন্দন বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলেন প্রদোষ চৌধুরী। তাঁবুর জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে চাইলেন। অনুভব করলেন, গন্ধটা সরে যাচ্ছে। হয়তো সামনের দিঘল ঘাসবনের মধ্যে ডুবে গেল গন্ধটা।

বন্দুক হাতে সেদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন প্রদোষ চৌধুরী। না, আর কোন সাড়া নেই। চলে গেছে বোধ হয়।

ঘড়ির দিকে একবার তাকালেন। রেডিয়াম ডায়ালে দেখা গেল সময় মাঝ রাত্রির স্টেশন সবে পার হয়ে গেছে।

বাইরে বেরিয়ে প্রদোষ চৌধুরী হাঁকডাক করে সবাইকে সতর্ক করে নিজের তাঁবুতে ফিরে এলেন তারপর পর্দার দরজা ফাঁক করে নদীর দিকে চোখ মেলে বন্দুক ধরে বসে রইলেন। কি জানি বাঘিনী যদি নদী পেরিয়ে ওপারে যায় চোখে পড়বে।

হঠাৎ একটা বার্কিং ডিয়ার এপারে কোথায় ডেকে ওঠে। সজাগ

হয়ে ওঠেন প্রদোষ চৌধুরী। বনের রাজা এখনো এপারে আছে তা না-হলে আশে পাশের কোন জঙ্গলে গা-ঢাকা দিয়ে আছে। তাকে দেখেই হয়তো বার্কিং ডিয়ার ডেকে উঠে জন্তুদের সাবধান করে দিল।

পাইপে আগুন দিলেন প্রদোষ চৌধুরী। একটা ভাবনা তার মাথায় পাক খেয়ে ওঠে। বাঘিনীটার এত কৌতূহল কেন! ভিতরে ঢোকবার পথ পেলে কি ঘটতে পারত সে-কথা ভেবে তার শিরদাঁড়া বেয়ে রোমাঞ্চকর এক অনুভূতি ওঠা-নামা করে।

বনের অজস্র চলমান শব্দের সঙ্গে ঝিঁঝিঁর গান মিলিমিশে নিঝুম রাত্রির গায় আঁকি-বুঁকি লিখছে।

পাহাড়ের মাথার ওপর চাঁদ উঠেছে।

কেউ যেন সলাজ্জ বনভূমিবধূর মুখের ঘোমটা একটুখানি তুলে ধরেছে। আমলকী গাছের তলায় পাতার জাফরি-কাটা জোছনা নেমেছে।

হঠাৎ আমলকী বনের নিচে অস্পষ্ট ছায়ার নড়চড়া দেখে বন্দুকের নল তুলে ধরেন প্রদোষ চৌধুরী। চোখের দৃষ্টি সংহত করে আলো-অন্ধকারের জট খুলে দেখে নিতে চাইলেন কারা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আচমকা অন্ধকার ফুঁড়ে একদল চিতল হরিণ জল খেতে নেমে এল নদীতে। কয়েকটা জল খায় আর কয়েকটা সজাগ পাহারা রাখে এপারে-ওপারে। সতর্ক কান পেরিস্কোপের মতো এদিক-ওদিক ঘোরে শব্দ ধরার জন্যে।

তাদের গায়ের যে টুকুতে আলো পড়েছে সেটুকু জোছনার সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার।

মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকেন প্রদোষ চৌধুরী। বন্দুকের নল তোলার কথা মনেও থাকে না। বোধ হয় চেতনা থেকে হিংসার অনুভব মুছে যায়।

হঠাৎ কার পায়ের শব্দে চমকে ওঠেন প্রদোষ চৌধুরী। দেখেন, তাঁবুর দরজার সামনে মিসেস কাঞ্জিলাল, আপনি!

আপনি! মণিকা কাঞ্জিলাল পালটা প্রশ্ন করেন, মাঝরাতে এমন ভাবে বসে যে?

ন্যানসিও মণিকা কাঞ্জিলালের পায়ে-পায়ে এসে হাজির হয়েছে।

ন্-না না। মাথা নাড়েন প্রদোষ চৌধুরী, তাঁবু থেকে আপনার বেরুন ঠিক হয়নি। বিনয় আপনাকে ছেড়ে দিল কি করে।

আপনার বন্ধুটি কি জেগে আছে। আর আপনি?

আমার কথা আলাদা—

বাঃ, বাঘ এসেছিল যে—!

দেখেছেন নাকি?

দেখিনি আবার! চোখ-মুখের ভাবটা কি রকম যেন করেন মণিকা কাঞ্জিলাল, ঘুম আসছিল না কিছুতে—জানালার পর্দা তুলে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলাম। তখনই দেখলাম—

কোনদিক থেকে এল?

আপনার পিছন দিকে নদীর ধার থেকে উঠে এলো। আমি তো ভয়ে কেঁপে মরি। ন্যানসি দেখতে পাচ্ছিল না কিন্তু গন্ধে বুঝতে পারছিল আর আমার পায়ে মাথা কুটে মরছিল ভয়ে। আপনার বন্ধুকে ডাকবো তাও পারছিলাম না। শব্দগুলো গলার ভেতর সব মরে রইল। ভয়ে চোখ বুঁজে রইলাম। একটু পরে দেখি, বাঘটা থাবা বাড়িয়ে তাঁবুর ক্যাম্বিস আঁচড়াচ্ছে।

তারপর?

হঠাৎ কিসের শব্দ হল আর বাঘটা লাফ দিয়ে ঘাস বনে ডুব দিলো।

—হুঁ। কি-যেন-একটা ভাবনা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকেন প্রদোষ চৌধুরী।

অনর্গল কথা বলে চলেন মণিকা কাঞ্জিলাল, চিড়িয়াখানা-সার্কাসের বাইরে কখনও বাঘ দেখিনি তাই অমন তাজা বাঘ দেখে অবাক হয়ে গেছিলাম। হলুদের ওপর ডোরা-কাটা চামড়ার বাহারে ঢাকা প্রকাণ্ড

শরীরটা কী নিঃশব্দে চলাফেরা করছিল। তার জ্বলন্ত হলুদ-সবুজ চোখে কঠিন জিঘাংসা এক টুকরো বরফের মতো ঠাণ্ডা ভয় দেখাচ্ছিল। লেজটা কখনো মাটি ছুঁয়ে থেকেও ছেলেমানুষী ইচ্ছেতে ছটফট করে মরছিল। বাঘটা চলে যাবার পর দেখি আপনি বেরিয়েছেন। যা ভয় করছিল আপনার জন্যে—।

মণিকা কাঞ্জিলালের মুখের দিকে তাকালেন প্রদোষ চৌধুরী।

আমি কি আর বেরুতাম। কৈফিয়ৎ দিতে চান মণিকা কাঞ্জিলাল, আপনাকে সাবধান করবার জন্যেই আসতে হল—

আগেও বলেছি, আবার বলছি রাত্রে কখনো এভাবে তাঁবুর বাইরে আসবেন না। কেমন যেন ভারি প্রদোষ চৌধুরীর গলার স্বর, আপনার মতো সুন্দরী সম্ভ্রান্ত মহিলাকে দেশালাইয়ের বাক্সের মতো নিমেষে তুলে নিয়ে যাবে—

তা' হবে। অপ্রতিভ হলেন মণিকা কাঞ্জিলাল, চলরে ষ্ঠানসি, আমরা যাই—

বিনয় কি করছে? ঘুমুচ্ছে?

না-হলে তো উঠে আসতোই।

চলুন আপনাকে এগিয়ে দি—

এই দশ-পা আর আপনাকে এগিয়ে দেবার দরকার নেই। বরং এখানে দাঁড়িয়ে বন্দুকের নল রেডি রাখুন।

প্রদোষ চৌধুরী কোন কথা না-বলে তাঁবুর দরজা পর্যন্ত মণিকা কাঞ্জিলালের সঙ্গী হলেন। তারপর এক-পা দু-পা করে ফিরে এসে চেয়ার টেনে তাঁবুর দরজায় বসলেন।

রাত্রির নিঝুম রাজত্ব ব্যেপে পাহাড়ি নদীর তিরতিরে ধারা ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে চলেছে। তার ওপাশে হেমন্তের আমলকী বনে ছায়া-আলোর মায়া।

নীলচে জোছনায় কারা যেন বনের রহস্যময় আঙিনায় এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। কখনো বুঝি তাদের চোখে দেখা যায়—কখনো

দেখা যায় না। পাতার মর্মরে বুঝি তাদের কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অনুভবে স্পষ্ট ধরা পড়ে। তারা হাতছানি দিয়ে ডাকছে, এসো— এসো আমাদের হাত ধরে আদিম অন্ধকারে ডুব দাও।

সকালে উঠে বেরিয়ে পড়েন প্রদোষ চৌধুরী।

নদীর খাত পেরিয়ে আমলকীবনের ভিতর দিয়ে পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে এগোতে লাগলেন। অত্যন্ত সন্তর্পনে চারদিকে কড়া নজর রেখে এগোতে তার দেরি হয়ে যেতে লাগল।

শিশির ভেজা বনে ভেষজ গন্ধের মতো অদ্ভুত একটা গন্ধ স্থির হয়ে আছে।

একটু করে এগোন প্রদোষ চৌধুরী আর দাঁড়িয়ে মাটি, গাছপালা ঝোপঝাড় তন্নতন্ন করে খুঁটিয়ে দেখেন। বাঘটা হয়তো বাঁদিকের জলরেখার আশেপাশে কোন পাহাড়ের খাঁজে বসে ভোজ খায় আর রোদের হাত এড়িয়ে তোফা আরামে ঘুম দেয়।

অসংখ্য বুনো জানোয়ারের পায়ের ছাপের সঙ্গে বাঘের পায়ের ছাপ মিশে আছে বটে তবে তা পুরোন। বাঘের টাটকা পায়ের ছাপ খোঁজার জন্যে আমলকীবনের সীমানা ছাড়িয়ে বনস্পতির মতো বিশাল শাল-সেগুনের বনে গিয়ে ঢুকলেন প্রদোষ চৌধুরী। আমলকীবনের চেয়ে শালবন চত্বরে ঝোপঝাড়ের আধিক্য বেশি। ডালপালার ছত্রছায়া ছড়িয়ে এইসব মহাকায় পাদপ কত যোজন প্রান্তর নিজেদের অধিকারে রেখেছে। শান্ত সমাহিত প্রাচীন বৃক্ষের দল পিতামহের অধিকারে বালক তরুশ্রেণীকে নৈসর্গিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করছে; সেই দীর্ঘ সংগ্রামের ক্ষত তাদের বাকলে শাখা-প্রশাখায় বিকীর্ণ। রোদ-বৃষ্টি ঝড়-ঝাপটার মারণ-উচাটনেও তাদের মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণশক্তির ঘাটতি নেই। অযুত পত্র-সমারোহে, মঞ্জরিত পুষ্প-বিকাশে অজস্র-সহস্র হয়ে নিজেকে প্রকাশ করছে।

সেই বিশাল বিপুল সমারোহের স্তব্ধ কোলাহলের মধ্যে মুগ্ধ হয়ে

দাঁড়িয়ে থাকেন প্রদোষ চৌধুরী। পাখিদের আশ্রয়—বনচারীদের নিকেতন আর মানুষের জন্যে অনাস্বাদিত আনন্দ-বিস্ময়ের স্বাদ ছড়ানো রয়েছে ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হয়ে আসা এই বনভূমিতে !

সামনের ঝোপটা হঠাৎ নড়ে-চড়ে উঠল।

কয়েক পা পিছিয়ে বন্দুক তুলে ধরলেন প্রদোষ চৌধুরী—কে জানে বনের রাজা হয়তো এই ঝোপের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে লাফিয়ে পড়বার সুযোগ খুঁজছে।

একটু পরে একটা সজারু ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে ঝমঝম করে কাঁটা বাজিয়ে অন্য একটা ঝোপের ভিতর গিয়ে ঢুকল।

চমকে দিয়েছিলি ! বন্দুকটা নামিয়ে প্রদোষ চৌধুরী সামনের দিকে এগোলেন।

সামনেই গ্রাম পড়ল একটা বনের মধ্যে—নাম ধূপগোরি। এই গ্রাম থেকেই একটা মেয়ে ধরে নিয়ে গেছে বাঘটা।

গ্রামবাসীদের কাছ থেকে বাঘটার যে খবর পেলেন তার ওপর নির্ভর করে বাঘের আনাগোনার খুব বেশি হদিশ পাওয়া গেল না।

আরো খানিকক্ষণ এদিক-সেদিক ঘুরে প্রদোষ চৌধুরী ফিরলেন।

মাথার ওপর এখন সূর্য।

এবার তিনি নদীর ধার ঘেঁষে নামতে লাগলেন। চার-পাঁচ ঘণ্টার হাঁটা-হাঁটিতে শরীর ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ পরে পাইপ ধরালেন। তাঁবুর কাছাকাছি গিয়ে থমকে গেলেন প্রদোষ চৌধুরী।

মণিকা কাঞ্জিলাল নাইতে নেমেছেন জলে। শাড়িটা এলিয়ে রয়েছে জলের ধারে পাথরের পরে। পরণে শুধুমাত্র প্যান্টি। মাথার চুল থেকে মুক্তোর মতো জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে। বুকের ওপর একজোড়া সোনার জামবাটি তার গায়ে রক্তচন্দনের ফোঁটা। বসনহীন অবয়বের সবটুকু অশরীরী লাবণ্যে ঝলমল করছে।

নীল আকাশের নিলাজ চোখ তারই পরে অপলক। আলো আর বাতাস বেহায়ার মতো হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

থমকে গেলেন প্রদোষ চৌধুরী। আশ্চর্য একটা অনুভূতি মদের নেশার মতো তার পৌরুষের স্নায়ুগুচ্ছকে শিথিল করে দিল। কী করবেন বুঝে উঠতে না পেরে গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেন। তার মনে হল, এ যেন বাঘের হাতে পড়ার চেয়ে ভয়ঙ্কর। এরকম একটা অনুভব সারা জীবনেও তার শরীরকে এমন করে আয়ত্ত করতে পারে নি।

কি-যেন-একটা বিদেশী গানের সুর গুনগুনিয়ে উঠছে মণিকা কাঞ্জিলালের ঠোঁটে। সাদা পাথরের পরে মোহরের মতো গড়িয়ে চলেছে সেই সুর।

গলা খাকারি দিলেন প্রদোষ চৌধুরী

চমকে ওঠেন মণিকা কাঞ্জিলাল। তার শরীরটা মুহূর্তের জন্যে ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মতো টানটান হয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে গোলাপি তোয়ালেটা টেনে গায়ের ওপর ফেলে একটু বুঝি বিহ্বল হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকেন। বিরক্তিতে তার ভুরু কুঁচকে গেছে।

আড়াল থেকে সাড়া দিলেন প্রদোষ চৌধুরী, সরি মিসেস কাঞ্জিলাল, রিয়েলি আই এ্যাম্ ভেরি সরি—

মণিকা কাঞ্জিলাল তৎক্ষণাৎ শাড়িটা গায় চড়িয়ে নিয়ে জলের ধারে একটা পাথরের ওপর বসে পড়েছেন।

এবার গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে জলের ধারে নেমে এলেন প্রদোষ চৌধুরী। তারপর বন্দুকটা পাশে রেখে এক টুকরো পাথরের ওপর বসলেন!

মাঝখানে পাহাড়ী নদী বয়ে চলেছে। এপারে একজন। অন্যজন ওপারে।

বড্ড ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন চৌধুরীসাহেব, মণিকা কাঞ্জিলাল হাসলেন।

পাইপে জোর টান দিয়ে অনর্গল ধোঁয়া ছাড়েন প্রদোষ চৌধুরী, আপনি না আমি।

আমি! মণিকা কাঞ্জিলালের চোখে অপলক বিস্ময়, আমি আবার ভয় পাইয়ে দিলাম কি করে!

কাল রাতে যে এসেছিল তার কথা কি ভুলে গেছেন?

কে বলুন তো! চোখ দুটোকে স্মৃতির অন্ধকারে ডুবিয়ে অসহায় মণিকা কাঞ্জিলাল বলেন, কে বলুন তো—আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না।

বনের রাজাকে এর মধ্যে ভুলে গেলেন—যে কাল রাতে আমার তাঁবুর কাপড় আঁচড়েছিল!

সে কি আর দিনের বেলায় এখানে হানা দিতে আসবে?

মিসেস কাঞ্জিলাল। একটু থামলেন প্রদোষ চৌধুরী, ঠিক এই মুহূর্তে সেই ডোরাকাটা জানোয়ারটা আমাদের নজরে রেখেছে কিনা বলতে পারছি না। তবে যদি রেখে থাকে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আপনার মাখনের মতো নরম শরীরটাকে পেলে আজ দুপুরে কোন ঝোপঝাড়ের আড়ালে কি পাহাড়ের আনাচে-কানাচে বসে চমৎকার একটা লাঞ্চ হয়ে যেত তার!

বলেন কি!

সত্যি তাই মিসেস কাঞ্জিলাল। মোলায়েম হাসেন প্রদোষ চৌধুরী, জঙ্গল যেমন সুন্দর তেমনি নির্মম! তার হৃদয়ের কোথাও মায়া-মমতার ঠিকানা লেখা-জোকা নেই।

স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকেন মণিকা কাঞ্জিলাল, তারপর ফিসফিস করে বলেন, মুশকিল কি জানেন চৌধুরীসাহেব, ভয়-ডর জিনিসটা আমার মনের কোথাও ঠাঁই পায় না।

ব্যাপারটাকে পরিহাস দিয়ে হালকা করতে চান প্রদোষ চৌধুরী, শাস্ত্রে নাকি লেখা আছে, পথি নারী বিবর্জিতা। এর সঙ্গে শাস্ত্রকারেরা বন কথাটাও জুড়ে দিতে পারতেন।

মুখ কাচুমাচু করেন মণিকা কাঞ্জিলাল, আপনাদের জংলী নিয়ম-কানুন ভারি বেয়াড়া। পোষাচ্ছে না আমার। ভাবছি ফিরে যাব।

সে রকম ইচ্ছে হলে আপনার বুদ্ধির তারিফ করতেই হবে। বিনয় তাঁবুতে নেই ?

আপনার পরেই তো বেরিয়ে গেছে।

গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে নাকি ? হাজারিবাগ শহরে গেছে ?

না। রাইফেল তুলে নিয়ে বলল, বেরুচ্ছি—

কোনদিকে গেল ?

সে তো বলতে পারবো না। খিলখিল করে হাসেন মণিকা কাঞ্জিলাল, বোধ হয় আপনার উলটো দিকে !

বিনয় যে এমন বেয়াক্কেলে সেটা আমার জানা ছিল না। বুঝতে পারছি না, আপনাকে এখানে নিয়ে আসার মানে কি ব্যাঘ্র মহারাজের কাছে ভেট দিয়ে যাওয়া।

চারদিকে এতো লোকজন ছড়ানো এর মধ্যে বাঘ আসতে সাহস করবে !

ম্যাডাম, জঙ্গল এদের কাছে চীনেভাষার মতো দুর্বোধ্য। কিছু একটা ঘটে গেলে সামাল দিতে পারবে কি ?

কিছু একটা ঘটুক না। আপনার তাতে কি ?

আমার তাতে কি। কথাটা পুনরাবৃত্তি করেন প্রদোষ চৌধুরী। সহসা উত্তর দিতে পারেন না। পায়ের কাছে ছড়ানো একটা-দুটো নুড়ি জলে ছুঁড়ে দিতে-দিতে জুতসই উত্তর হাতড়াতে থাকেন প্রদোষ চৌধুরী। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলেন, পৃথিবীতে কে কখন কোনটাকে ক্ষতি বলে মানে সে হিসেবের কি অন্ত আছে মিসেস কাঞ্জিলাল।

হেমন্তের বাতাসে গাছপালার অদ্ভুত একটা গন্ধ ইতি-উতি ছুটে যাচ্ছে। রোদের তাপ তাঁবু ফেলেছে বনস্থলীতে।

কথা যোগায় না মণিকা কাঞ্জিলালের মুখে। তাই চুপ করে থাকেন।

সোনালি গমের মতো রোদ ছড়িয়ে আছে চারিদিকে।

কি, কথা বলছেন না যে?

ভাবছি।

কি? গাছ থেকে পাতা পড়ার মতো শব্দ হলো প্রদোষ চৌধুরীর ঠোঁটে।

ভাবছি হেমন্তের দিনে রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান মনে পড়ল কেন।

কোন গানটা মিসেস কাঞ্জিলাল?

এপারে মুখর হল কেকা ঐ ওপারে নীরব কেন কুহু হায়!

মণিকা কাঞ্জিলালের মুখের রেখায় তার মনের ইশারার স্পষ্ট আন্দাজ না-পেয়ে বোকা-বোকা মুখে প্রদোষ চৌধুরী উত্তর দিলেন, মনের ঠিকানা কে পায় বলুন! কোন লেখক নাকি বলেছেন, সমুদ্রের থেকে আকাশ অনেক বড়, আর আকাশের থেকে মানুষের মন আরো অনেক বড়ো। তার সীমানা নেই। তার সঙ্গে আরেকটু জুড়ে দিলে ভালো হতো, পুরুষের মনের চেয়ে মেয়েদের মনের সীমানা আরো বড়ো।

পাহাড়ী নদীটার জলের নিচে অজস্র অপরূপ পাথর ছড়ানো লালচে-বাদামী নীলচে-কালো গাঢ় নীল ঈষৎ বাদামী। পাখনা-ভাসানো হালকা সবুজ মাছের ঝাঁক জলের স্রোতে গা-ভাসিয়ে খুশির খেয়ালে মেতে উঠেছে।

একটা কথা বলবো চৌধুরীসাহেব রাগ করবেন না তো?

নড়েচড়ে বসেন প্রদোষ চৌধুরী, আমার ক্ষমতা সম্পর্কে আপনার উঁচু ধারণার তারিফ করতে পারছি নে।

সে কথায় কান না-দিয়ে মণিকা কাঞ্জিলাল হাসেন, মেয়েদের সম্পর্কে আপনার বড্ড ভয় তাই না চৌধুরীসাহেব?

ভয়! অবাক হলেন প্রদোষ চৌধুরী, ভয় করবার কি আছে। কিসের ভয় বলুন তো মিসেস কাঞ্জিলাল?

আমি কি জানি। হিংসুটে একটা খুশি মণিকা কাঞ্জিলালের ঠোঁটে দাপাদাপি করে।

কি-একটা পাখি ডাকছে, টু—হু টু—হু টু—রু—রু—রু—।

পাতার আড়াল থেকে আরেকটা পাখি সাড়া দিল, টু—রু—টু—টু—রু—টু টু—রু—টু।

মাসটা নভেম্বর।

পাখিদের বাসা বাধবার সময়।

শীতের মৃদু আনাগোনা গাছপালার ছায়ায় হাত বাড়িয়েছে। তবু রোদে এখনো তাপ।

রামগড় পাহাড়ের ছায়া শিঙেল হরিণের মতো পুব দিকে গলা বাড়িয়েছে।

জীবনের শূন্যতার একটা পরিমাপ প্রদোষ চৌধুরীর কাছে হঠাৎ বুঝি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিজের অজান্তে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স্বগতোক্তি করেন, জীবনের অনেকখানি সময় নিজের কাজের মধ্যে ডুবেছিলাম। রূপ-রস-গন্ধের পৃথিবীকে বোধ হয় নির্বাসন দিয়েছিলাম সন্ন্যাসীদের মতো ; মেয়েদের আর কতটুকু দেখেছি। কখনো যে তারা ধ্যানভঙ্গ করেনি এমন কথা বলতে পারিনে। সে চমক কাজের বেগে বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে গেছে। তবে একথা স্বীকার করতে দোষ নেই, কাঁচের মতো স্বচ্ছ একটা কৌতূহলের প্রলেপ মনটাকে ঘিরে রেখেছে। প্রদোষ চৌধুরীর দুর্বোধ্য চোখে কিছু ভাবনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মিসেস কাঞ্জিলাল তার টকটকে লাল নখে দাঁত ছোঁয়াচ্ছিলেন। হঠাৎ বুঝি ব্যস্ত হয়ে বললেন, চলুন ওঠা যাক। অনেক পথ হেঁটে এলেন ; এক কাপ চায়ের জন্যে আপনার মন উসখুস করছে বোধ হয়—তাই না ?

হেসে উঠে পড়েন প্রদোষ চৌধুরী, কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়।

ওকি ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন চৌধুরীসাহেব? ছোট মেয়ের মতো চেঁচিয়ে ওঠেন মণিকা কাঞ্জিলাল।

এখানে জলটা বেশি। তাই ভাবছি নিচের দিকে নেমে পার হব।

মণিকা কাঞ্জিলাল একেবারে জলের কাছে সরে এসে দাঁড়ালেন, আমার হাত ধরে পাথরে পা রেখে চলে আসুন। খুব সাবধান, যা পিছল পা হড়কে না যায়।

পারবো? হাসলেন প্রদোষ চৌধুরী, ভয় হচ্ছে পা যদি পিছলে যায়।

এটুকু পারবেন না।

ঝুকে পড়ে বন্দুকটা এগিয়ে দিলেন প্রদোষ চৌধুরী।

আদ্দেকটা পার হলেই আমাকে ছুঁতে পারবেন। উৎসাহ জোগান মণিকা কাঞ্জিলাল।

খানিকটা পার হয়ে একটা পিছল পাথরে পা রাখতেই বেসামাল হয়ে গেলেন প্রদোষ চৌধুরী। তারপর নিজেকে বাঁচাতে মণিকা কাঞ্জিলালের গায়ের উপর গিয়ে পড়লেন।

দুহাতে প্রদোষ চৌধুরীকে জাপটে ধরেন মণিকা কাঞ্জিলাল।

মুহূর্তের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে গেলেন প্রদোষ চৌধুরী। আনকোরা একটা তাজা গন্ধ তার শরীরের সহজ দাহ্য রক্তস্রোতে আগুন জ্বালিয়ে দিল বুঝি। তার মনে হল অনন্ত কাল অক্ষয় এক স্বর্গ-সুখের দরজায় মাথা কুটে পড়ে আছেন।

আঃ, ছাড়ুন আমাকে। আলতো ভাবে নিজেকে ছাড়াতে চান মণিকা কাঞ্জিলাল।

এতক্ষণে খেয়াল হল প্রদোষ চৌধুরীর। গুণ ছেঁড়া ধনুকের মতো সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। লজ্জায় তাকাতে না-পেরে বন্দুক তোলার আছিলায় অন্যদিকে সরে পাড়ের উপরের দিকে উঠতে লাগলেন।

একি, আমাকে একলা ফেলে যাচ্ছেন যে চৌধুরীসাহেব!

দাঁড়িয়ে গেলেন প্রদোষ চৌধুরী, আপনাকে ধরতে হবে নাকি!

বাঃ। বাতাসে শব্দটা উড়িয়ে দিলেন মণিকা কাঞ্জিলাল, এবড়ো-খেবড়ো পাথর ভেঙে আমি উপরে উঠতে পারবো।

মণিকা কাঞ্জিলালের বাড়িয়ে দেওয়া হাত ধরে প্রদোষ চৌধুরী তাকে পাড়ের ওপর তুললেন।

লোক বটে আপনি। চোখ বড়ো-বড়ো করে তাকান মণিকা কাঞ্জিলাল।

কেন ? যেতে-যেতে মৃদু হাসেন প্রদোষ চৌধুরী।

অত বড়ো একটা পতন থেকে আপনাকে বাঁচালাম আর আমাকেই ফেলে পালাচ্ছিলেন।

না-না।

তা'ছাড়া আর কি। মহিলাদের সাহায্য করার একটা রীতি যে সভ্য সমাজে চালু আছে সেটাও দেখছি আপনার জানা নেই। মৃদু হাসি মণিকা কাঞ্জিলালের মুখে।

সত্যিই জানা নেই। উত্তরটা ভারি গলায় দিয়ে হো-হো করে হেসে ওঠেন প্রদোষ চৌধুরী, এসব আমার মতো কন্‌ফার্মড্‌ ব্যাচিলরদের অনভ্যাসের ফল!

তাই তো দেখছি। আপনি আর নিজের তাঁবুর দিকে পা বাড়াবেন না। চলুন এখুনি চা এনে দিচ্ছি—

দুপুরের অনেক পরে বিনয় কাঞ্জিলাল ফিরলেন।

এতক্ষণে তবু ফেরবার কথা মনে পড়লো। উদাস একটা খেদোক্তি মণিকা কাঞ্জিলালের গলায় ভেসে ওঠে।

রাইফেলটা রেখে বিনয় কাঞ্জিলাল মণিকাকে জড়িয়ে ধরলেন।

আঃ, ছাড়ো দিকিন।

কেন ডিয়ারি ?

কেউ দেখে ফেলবে।

তোমার পোষ্যটি ছাড়া কাউকে তো দেখছি না। দেখ-দেখ, কি রকম নির্লজ্জ চোখে পিট্ পিট্ করে তাকাচ্ছে ন্যানসি।

মণিকা কাঞ্জিলালের পায়ের তলায় বসে ঘড়্ ঘড়্ আওয়াজ করে ন্যানসি।

আমার সম্পর্কে জেলাস হয়ে উঠেছে।

বাজে ব'কো না। গলার স্বর পালটে মণিকা কাঞ্জিলাল বলেন, কতো দেরি করে ফিরলে। কতদিন বলেছি, দুপুরের খাবার সময়টা হের-ফের করবে না। ওতে স্বাস্থ্য টেকে না।

চেষ্টা করেছিলাম ফিরতে; বেলাটা আন্দাজ করতে পারিনি। তাছাড়া পাহাড়ি পথে ঘুরে-ঘুরে হয়রান—পথও হারিয়ে ফেলেছিলাম বোধ হয়—

তোমার বন্ধুরও তো একই দশা।

তাই নাকি। কখন ফিরলো চৌধুরী ?

ঘড়ি দেখিনি। তবে সূর্য হেলে গেছিল।

কিছু বললো ? আয়েশ করে সিগারেট ধরালেন বিনয় কাঞ্জিলাল।

বাঘের পাত্তা করতে পারেন নি। কি আর বলবেন। ঠোঁট ওলটালেন মণিকা কাঞ্জিলাল, তাই তোমার ওপর রাগ করছিলেন।

কেন ?

চকচকে হাসি স্পষ্ট হয়ে ওঠে মণিকা কাঞ্জিলালের ঠোঁটে, বনের রাজা নাকি আমাকে ইলোপ করতে পারে।

তোমাকে ! ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তাকান বিনয় কাঞ্জিলাল।

হ্যাঁ—গো—হ্যাঁ, তাই তো বলছিলেন।

বুটের ফিতে আগলা করতে-করতে হো-হো করে হেসে ওঠেন বিনয় কাঞ্জিলাল, কথাটা নেহাৎ মিথ্যে বলেনি প্রদোষ—সে রকম ইচ্ছে হওয়াটা বাঘের পক্ষে অসম্ভব নয়। আমাকেই তোমার সৌন্দর্য

কম ফুসলে ছিল নাকি ! জুতো-মোজার বন্দীত্ব থেকে ক্লান্ত পা-জোড়াকে মুক্তি দিয়ে সোজা হয়ে বসলেন বিনয় কাঞ্জিলাল, চৌধুরী লোকটা কিন্তু বেশ ভালো।

কি রকম ভালো সেটা অবশ্য আমি বলতে পারবো না।

মেয়েদের সম্পর্কে একটু কিন্তু-কিন্তু ভাব মানে, সোজা কথায় মেয়েদের এড়িয়ে চলতেই ভালোবাসে; আদার ওয়াইজ্ হি ইজ্ এ পারফেক্ট জেন্টেলম্যান। পয়সা থাকলে লোকের যে সব ভাইসেস্ থাকে সে সব কিছু প্রদোষের নেই।

আমার জঙ্গলে আসাটা কিন্তু চৌধুরীসাহেবের একেবারে পছন্দ নয়।

সে তুমি বলে নয়—রিস্‌ক্ আছে বলে।

নাও. আর দেরি করো না। সাবান দিয়ে হাতটা ধুয়ে এসো—আজ তোমার খেতে কতো দেরি হয়ে গেল বলো তো ডার্লিং। বিনয় কাঞ্জিলালের গালে আলতো করে ঠোঁট ছুঁইয়ে মণিকা কাঞ্জিলাল আদর করলেন তাকে, এমনি করলে শরীর থাকে ?

খেয়ে উঠে সিগারেট ধরালেন বিনয় কাঞ্জিলাল।

মণিকা ফ্লাস্ক থেকে গরম কফি এনে দিলেন।

সো লাভলি! কফির কাপে চুমুক দিয়ে বিনয় কাঞ্জিলাল খুশি হয়ে উঠলেন।

এখন ঘুমোবে নাকি ?

চেষ্টা করবো না-ঘুমুতে। তবে পারবো বলে মনে হয় না।

ঘুমুলেই কিন্তু শরীর খারাপ হবে।

জানি ?

তার চেয়ে বরং একটা বই-টই পড়ে দেখ ঘুমটা এড়াতে পারো কিনা।

তাই দাও। শুয়ে চোখ বোলাই—

বিনয় কাঞ্জিলালকে বইটা দিয়ে মণিকা কাঞ্জিলাল উলের বল নিয়ে বসলেন।

ন্যানসিও উঠে এসে তার কাছে গুটিসুটি মেরে শুয়ে রইল।

রঙিন পশমের সুতো দিয়ে পুল্‌ওভারে নকশা বুনতে-বুনতে তাঁবুর নিভৃত অন্ধকারে মণিকা কাঞ্জিলাল গুনগুনিয়ে উঠল :

দিনান্তের এই এক কোণাতে
সন্ধ্যা-মেঘের শেষ সোনাতে—

নভেম্বরের সূর্য পাহাড়ের আড়ালে সরে গেছে।

দূরে-দূরে আমলকী পাতার টোপর রোদে-বাতাসে ঝিলমিল করছে। অন্ধকারের আভাসে পাখি-পাখালির কাকলিতে বনস্থলী ভরে উঠেছে! বিকেল বেলার এই আলো-অন্ধকারের প্রহরে তাঁবুর নিভৃতি ভালো লাগে না প্রদোষ চৌধুরীর। ইচ্ছে করছিল, রাঁচি-হাজারিবাগ রোডের যে অংশটা তাঁবুর পিছন দিয়ে বেঁকে গিয়ে হাজারিবাগ সহরের দিকে মোড় দিয়েছে সেখানে পায়চারি করে বেড়াবেন।

হাজারিবাগ-রাঁচি রোডের এই জায়গাটা প্রদোষ চৌধুরীর খুব প্রিয়। এর আগে কতবার এখানে এসেছেন।

এখান থেকে মাইল দুয়েক দূরে ঝিঙেরি ডাকবাংলো। কোডার্মা থেকে ছুটি নিয়ে কতদিন এই ঝিঙেরির ডাকবাংলোয় গাড়ি চালিয়ে এসেছেন।

একবার তো সেই ডাকবাংলোর বারান্দায় বাঘের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। ভাবলে, এখনো গা ছমছম করে!

সারাদিন জঙ্গলে শিকারের খোঁজে তন্ন-তন্ন করে ঘুরে বন-মোরগ, বন-তিতির আর কয়েকটা খরগোস ছাড়া কিছু চোখে পড়েনি। ক্লান্ত হয়ে ফিরছিলেন। পাহাড়ে ওঠানামা আর বন-জঙ্গলে ঘোরাঘুরির ধকলে শরীর একেবারে এলিয়ে গেছিল। সারাক্ষণ পথ চলতে-চলতে ভাবছিলেন, কখন ডাকবাংলোর হাতায় গিয়ে ইজিচেয়ারে বসে চায়ের কাপ হাতে নেবেন।

শেষের পথটুকুতে পা আর চলতে চায় না।

ঝিঙেরির বাংলো এই তিরি নদীর ধারে উঁচু একটা টিলার পর।

টিলাটা পেছন দিকটা ঢালু হায় জঙ্গলে গিয়ে মিশেছে। বাংলোর সামনে বুড়ো একটা রেন-ট্রি সারাটা চত্বর অন্ধকার করে রেখেছে। কতদিন ডাকবাংলোয় বেড়াতে এসে এই গাছটার নিচে বসে মধ্যদিনের বিজন প্রান্তরে চোখ ফেলেছেন। টিলার নিচে এসে যখন প্রদোষ চৌধুরী দাঁড়ালেন তখনো আবছা একটা আলো বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

শরীরের ফুরিয়ে যাওয়া সমস্ত শক্তিকে চাঙ্গা করবার জন্যে টিলার নিচে দাঁড়িয়ে দম নিলেন একটু সময় তারপর বন্দুকটাকে তুলে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন প্রদোষ চৌধুরী।

সিঁড়ি শেষ করে যখন বাংলোর চত্বরে পা দিলেন তখন শরীরে আর এতটুকু সামর্থ্য অবশিষ্ট নেই।

রেন-ট্রির অন্ধকারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে হাতার দিকে এগিয়ে গেলেন।

চারদিকের অসমীচীন নৈঃশব্দ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে কি-রকম-যেন মনে হল তার। অদ্ভুত একটা অনুভূতি কুয়াশার মতো তার মনকে ছেয়ে ফেলল। মনে হল, কোথায় যেন একটা বিপদ এই অন্ধকারে ঘাপটি মেরে আছে। বেসুরো একটা অমঙ্গলের রেশ মনের মধ্যে তখন একটানা বেজে চলেছে।

একটু এগোতেই গাঢ় একটা গন্ধ এসে তার নাকে এসে ধাক্কা মারল। চমকে উঠলেন প্রদোষ চৌধুরী।

অন্ধকারে জোনাকি উড়ে বেড়াচ্ছে।

রেন-ট্রি গাছের অন্ধকারে চারদিকে তাকিয়েও কিছু দেখতে পেলেন না। হঠাৎ তার চোখ হাতার জমাট অন্ধকারের এক জায়গায় গিয়ে থমকে গেল।

ভয়ঙ্কর একজোড়া ছলছলে নীলচে-হলুদ আগুন তার দিকে তাকিয়ে আছে। প্রদোষ চৌধুরীর মনে হল তার হৃদপিণ্ডে মৃত্যুর শীতল হাতের ছোঁয়া লাগছে। হাতার অন্ধকার তার চোখে ক্রমশ সহ্য হয়ে আসছিল আর স্পষ্টই হয়ে উঠছিল ভয়ঙ্কর একটা মুখ। অত কাছ থেকে সেই

ভয়ঙ্কর অস্তিত্ব প্রদোষ চৌধুরীকে বিমূঢ় করে দিয়েছিল। হাতের বন্দুকটার কথা ভুলে গেছিলেন।

দু'জন দু'জনের তাকিয়ে—কতক্ষণ সে-কথা আজ আর মনে নেই। হঠাৎ ঝপ করে একটা শব্দ হল। হাতার ওপর থেকে সেই অস্তিত্বটা হঠাৎ অশরীরী হয়ে গেল।

সেই মুহূর্তে প্রদোষ চৌধুরী তার হাতের বন্দুকটাকে তুলে সম্ভাব্য একটা আক্রমণের প্রতিরোধে বাগিয়ে ধরলেন।

কতক্ষণ পরে বাংলো দেখা-শোনা করে যে-লোকটা সে তার একজন সঙ্গী নিয়ে ফিরে সাহেবকে বাংলোর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গেল।

লোকটার হাতের মশাল নিয়ে প্রদোষ চৌধুরী বারান্দায় উঠে চারপাশ ঘুরে দেখলেন, বনের রাজা চলে গেছে।

আপনি! মুখ তুলে মণিকা কাঞ্জিলালকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন প্রদোষ চৌধুরী।

বোধহয় তাঁবুর অন্ধকার আপনার মতো ভালো লাগছিল না। মণিকা কাঞ্জিলালের মুখে হাসি ঝিলমিলিয়ে ওঠে।

মুগ্ধ চোখে তাকান প্রদোষ চৌধুরী। মিকিমাতো মুক্তোর মালায়, বিন্যস্ত প্রসাধনে রূপসী মণিকা কাঞ্জিলাল অসাধারণ।

কিছু বলছেন না যে?

বলছিলাম, বিনয় তো অনেকক্ষণ ফিরেছে।

জেগে আছে কিনা, সে কথাটা জিজ্ঞাসা করুন।

এই অবেলায় ঘুমোল!

ঘুমের সঙ্গে অনেকক্ষণ লড়েছিলেন বীরপুরুষ তারপর একটু আগে নক্-আউট হয়ে ক্যাম্প খাটে এলিয়ে আছেন।

জোর গলায় হেসে ওঠেন প্রদোষ চৌধুরী, রেঞ্জার সাহেবের সুখের শরীর—ধকলে ক্লান্ত হয়ে গেছে। আমাদের কুলি খাটানো শরীর সহজে ক্লান্ত হইনে।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

মন জিনিসটা ভারি আশ্চর্য মিসেস কাঞ্জিলাল, এই তো একটু আগে আমিও ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। মনের যেমনি ইচ্ছে হল, অমনি সব ক্লান্তি ঝেড়ে-ঝুড়ে ফেলে আমাকে বেরিয়ে পড়তে হল। এখন এই গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে নিজেকে আর এতটুকু ক্লান্ত মনে হচ্ছে না। হঠাৎ ন্যানসির দিকে চোখ পড়তে ঝুঁকে পড়ে তাকে কোলে তুলে নিলেন প্রদোষ চৌধুরী, কি রে কেমন লাগছে তোর মিস ন্যানসি ?

হাজারিবাগ শহরের দিকে একটা বাস চলে গেল।

চলুন না চৌধুরী সাহেব একটু সামনের দিকে এগোই—ন্যানসিকে আপনি ছেড়ে দিন বেচারা একটু দৌড়োদৌড়ি করুক—একদম খেতে চাইছে না। মিসেস কাঞ্জিলাল ছায়া-ঘনিয়ে-আসা বনের চারদিকে একবার তাকিয়ে বললেন, যাবো আর ফিরবো।

দাঁড়াবো না কিন্তু তাহলে অন্ধকার হয়ে যাবে। ক্রীচ্ ভেঙে একবার বন্দুকটা দেখে নিলেন প্রদোষ চৌধুরী গুলি ভরা আছে কিনা।

তাই চলুন। আয় ন্যানসি একটু বেড়িয়ে আসি—।

হঠাৎ প্রদোষ চৌধুরী একটু বুঝি ব্যস্ত হয়ে বললেন, চলুন একটু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে—গড়-পাহাড়ির ধ্বংসাবশেষ আপনাকে দেখিয়ে আনি—

খুশি-খুশি গলায় মণিকা কাঞ্জিলাল বললেন, তাই চলুন—

এই সামনের আমলকীবন পার হলেই পৌঁছে যাবো।

কি আছে সেখানে চৌধুরী সাহেব ?

ভাঙাচোরা একটা গড় আর বিষণ্ণ একটা গল্প।

গল্প ? যেতে-যেতে অবাক হয়ে তাকালেন মণিকা কাঞ্জিলাল।

না, গল্প ঠিক নয়। হয়তো এই রকম কিছু একটা ঘটেছিল। অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিতে-দিতে হঠাৎ সজাগ হয়ে ওঠেন প্রদোষ চৌধুরী, বেশি দিনকার ঘটনা নয়। মাত্র একশ বিশ-পঁচিশ বছর আগেকার ঘটনা। সিপাই বিদ্রোহের সময়কার।

আঠারো শ’ সাতান্ন-আঠান্ন সালের কোন এক সময় ব্যাপারটা ঘটেছিল বোধহয়। একটুখানি আত্মগত হয়ে সুরু করেন, হাজারিবাগের এ এলাকার রাজা ছিলেন রেনসিং শেলাঙ্কি। চব্বিশ-পঁচিশ বছরের রাজপুত যুবক সবে ইন্দারগড়ের রাজকন্যাকে বিয়ে করে সুখের সংসার গড়ে তুলেছিলেন হাজারিবাগের এই বন-পাহাড়ি অঞ্চলে।

এমন সময় একদিন, রেনসিং শেলাঙ্কির কাছে কুনোয়ার সিংয়ের লোক এল। এক রাজপুত সামন্তের কাছে আর এক রাজপুত সামন্ত সাহায্যের আবেদন জানালেন। জ্যোতিষীরা গণনা করে দেখেছেন, ১৭৫৭-র পলাশীর যুদ্ধের একশ বছর পরে ইংরেজরাজ খতম হবে। সেই সময় এখন হয়েছে। লক্ষ্ণৌয়ে তামাম হিন্দুস্থানের রাজা-নবাব বাহাদুর-বারেরা সবাই গিয়ে জমেছে। চারদিকে গদরের আগুন জ্বলছে। সবাই গিয়ে যদি ইংরেজদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাহলে সহজেই হিন্দুস্থান থেকে তাদের হঠিয়ে দিতে পারবে।

যুদ্ধ রাজপুতের রক্তে। যুদ্ধের নাম শুনেই রেনসিং শেলাঙ্কির তলোয়ারে রোদ চমকে উঠল। গড়-পাহাড়ির চারপাশে হাতিয়ার-বন্ধ ফৌজের জমায়েত হতে লাগল।

মুশকিল হল, পিয়ারের রানীকে নিয়ে। তাকে কার কাছে রেখে যাবে। তার এক কাকার সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘদিন বিবাদ-বিসম্বাদ চলছে। গড়-পাহাড়ি ছেড়ে যাবার পর কাকা যদি এসে এখানে হামলা চালায়।

কুচ্ পরোয়া নেই। একদল বিশ্বস্ত অনুচর রেখে রেনসিং শেলাঙ্কি বন-পাহাড় ভেঙে এগিয়ে গেল লক্ষ্ণৌর দিকে। কথা আছে মীর্জাপুরের কাছে কুনোয়ার সিংয়ের দলের সঙ্গে মিলবে।

যাবার সময় রানীসাহেবাকে বলে গেল, বিপদ দেখলে বাঁধের দরজা খুলে দিও। হামলাকারীরা সব জলে ভেসে যাবে। তোমরা পাহাড়ে উঠে যেতেও পারবে।

লক্ষ্ণৌয়ের যুদ্ধে বিদ্রোহীরা শোচনীয় ভাবে হেরে গেল। আহমেদ

শাহ, মুম্মু খান, কুনোয়ার সিং, ফিরোজ শাহ যে যার বাহিনী নিয়ে লক্ষ্ণৌ থেকে সরে পড়তে লাগলেন।

আমাদের কাহিনীর নায়ক রেনসিং শেলাঙ্কিও নিজের জমিদারীর দিকে পা বাড়াল। এতদিনে তার পিয়ারের রানীসাহেবার জন্যে তার মন উতলা হয়ে উঠেছে। বেচারা যতো তাড়াতাড়ি ফিরতে চাইল ফেরাটা ততো সহজ হল না। পথ-ঘাট গোরা সিপাইদের আয়ত্তে। সুতরাং তাদের এড়িয়ে যেতে হলে বন-জঙ্গলের আড়াল নিতে হয়। তবু রেনসিং কোম্পানী ফৌজের হাত এড়াতে পারল না। ক্যাপ্টেন মীডের পাহারাদার বাহিনীর পাল্লায় পড়ে গেল। সামনাসামনি লড়াইয়ে রেনসিং শেলাঙ্কি গুলি লেগে মারা পড়ল।

জায়গাটা হাজারিবাগ থেকে দূরে নয়। খবর পৌঁছতে দেরি হল না রানীসাহেবার কাছে—ক্যাপ্টেন মীড্ এবার গড়-পাহাড়ির দখল নিতে আসছে। রানীসাহেবা এগিয়ে এল বাধা দিতে। রাজপুত-ভুঁইহার-সাঁওতালদের জড় করল তার ফৌজে।

স্যাণ্ডহার্স্টের রণ-নৈপুণ্যের কাছে হাজারিবাগের গেঁয়ো রানীর সব কৌশল ব্যর্থ হয়ে গেল। তার ওপর হাইল্যাণ্ডার গোলন্দাজদের দক্ষতায় প্রতিরোধও টিকলো না। রানীসাহেবা তার দলবল নিয়ে জঙ্গলে গা-ঢাকা দেবার জন্যে পা বাড়িয়েছিল সেই সময় কোম্পানী ফৌজ তাদের পথ আটকাবার জন্যে গোলা দেগে বাঁধ দিল ভেঙে।

বাঁধের জলের তোড়ে রানীসাহেবা তার দলবল নিয়ে কোথায় ভেসে গেল কে জানে! ডুবে গেল গড়-পাহাড়ি। তার প্রাসাদ-মন্দির-পথঘাট-বসতি। কতদিন ডুবে ছিল কে জানে। মানুষজন আর এই জঙ্গলে বসতি করতে আসেনি। সেই থেকে পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে গড়-পাহাড়ি।

একটু থেমে প্রদোষ চৌধুরী বললেন, এই যে আমরা এসে গেছি। দেখুন মিসেস কাঞ্জিলাল, শ'খানেক বছরের পুরোন প্রাসাদ এখনো

তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। ফি-বছর বর্ষায় আধ কোমর জলে ডুবে থাকে গড়-পাহাড়ি। শীতে বুনো জন্তুরা এসে বসতি করে।

অপলক হয়ে তাকিয়ে থাকেন মিসেস কাঞ্জিলাল।

এক ঝাঁক রোদ এসে বসেছে গড়-পাহাড়ির চুড়োয়।

মিসেস কাঞ্জিলালের প্রসাধনের মৃদু সৌরভ গোধূলির সময়কে বিহ্বলতা এনে দেয়।

মিসেস কাঞ্জিলালের পাশে দাঁড়িয়ে প্রদোষ চৌধুরী নির্জনতাকে আহত না করে মৃদুকণ্ঠে বলেন, মানব জীবনের সুখ-দুঃখের কতো কাহিনী আড়ালে-অবড়ালে এমনি করে হারিয়ে আছে। ইতিহাস এদের ঠাঁই দেয় নি। মানুষের স্মৃতিতে বেঁচে থাকতেও পারে নি। অথচ এদের মুখোমুখি হলে কি রকম একটা বিষণ্নতা আমাদের পেয়ে বসে—!

হঠাৎ কিসের একটা শব্দ হতে ফিরে তাকালেন প্রদোষ চৌধুরী। চমকে উঠে মণিকা কাঞ্জিলালও এদিক-ওদিক তাকালেন, ন্যানসি—ন্যানসি—! আমার ন্যানসি কোথায় গেল চৌধুরীসাহেব।

আমলকী বনের থমথমে অন্ধকারে শব্দগুলো ছুটে গেল। রাত্রির দুরন্ত অন্ধকার অরণ্যের আনাচে-কানাচে ভিড় করতে শুরু করেছে।

ন্যানসি—ন্যানসি। আর্তনাদ করে উঠলেন মণিকা কাঞ্জিলাল।

বন্দুকটা বাগিয়ে প্রদোষ চৌধুরী ভারি গলায় বললেন, অন্ধকার হয়ে আসছে মিসেস কাঞ্জিলাল। এখানে আর দাঁড়ান যাবে না।

আমার ন্যানসি!

সে চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে। তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তার মানে! ছলছল করে ওঠে মণিকা কাঞ্জিলালের গলা।

সেটা এখানে নয় তাঁবুর মধ্যে বসে আপনাকে বুঝিয়ে দেব। দেরি করবেন না। জোর পায় এগোন।

প্রদোষ চৌধুরীর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে থতমত খেয়ে তাঁবুর দিকে এগোতে থাকেন মণিকা কাঞ্জিলাল।

তাঁবুর নিরাপদ সীমানায় পৌঁছে প্রদোষ চৌধুরী চুক্‌-চুক্‌ শব্দ করেন, বড্ড ভুল হয়ে গেছে। আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। গড়-পাহাড়ির দিকে তাকিয়ে কেমন যেন আনমনা হয়ে গেছিলাম। সেই সময়ই ব্যাপারটা ঘটে গেল। সরি, মিসেস কাঞ্জিলাল, এক্‌স্ট্রিম্‌লি সরি!

আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না চৌধুরীসাহেব! অসহায় চোখে তাকান মিসেস কাঞ্জিলাল।

বেয়ারা চা রেখে গেল।

চায়ে চুমুক দিয়ে প্রদোষ চৌধুরী বলেন, মিসেস কাঞ্জিলাল ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে কেঁদো বাঘ এসেছিল ন্যানসিকে নিতে। মানুষ-খেকো হলে আমাদের কাউকে নিয়ে যেত।

উঠে পড়লেন মিসেস কাঞ্জিলাল, ন্যানসি আমার নিজের মেয়ের মতো ছিল চৌধুরীসাহেব। কান্না সামলাতে না-পেরে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে গেলেন মিসেস কাঞ্জিলাল।

বেচারা! প্রদোষ চৌধুরী পাইপে আগুন ছোঁয়ালেন।

বিনয় কাঞ্জিলালের তাঁবু থেকে ফিরতে রাত হয়ে গেল প্রদোষ চৌধুরীর। রাতের খাওয়াটা একেবারে শেষ করে ফিরলেন।

বিনয়কে গাড়ি এসে হাজারিবাগ শহরে নিয়ে গেছে। সেখানে রাজ্যের বনমন্ত্রী অরণ্য-সংরক্ষণ সপ্তাহের উদ্বোধন করবেন। বন বিভাগের পদস্থ সব কর্মচারীকে হাজির থাকতে হবে।

ফেরবার পথে কুলি ও তাঁবুর লোকজনদের সাবধান করে দিয়ে এলেন। রাত্রে কেউ যেন জরুরি দরকারেও তাঁবুর বাইরে না আসে। যে সব সশস্ত্র প্রহরী ছিল তাদের তাঁবুর ভেতরে থেকেই পাহারা দেবার নির্দেশ দিলেন। একটা পেট্রোম্যাক্স তাঁবুগুলোর মাঝখানে সারারাত জ্বালিয়ে রাখার ব্যবস্থা করলেন।

তাঁবুতে গিয়ে যখন প্রদোষ চৌধুরী বসলেন তখন রাত এক প্রহর

পার হয়ে গেছে। মাথার ওপর চাঁদোয়ার মতো বিছিয়ে আছে হেমন্তের তারা-ভরা উজ্জ্বল আকাশ। চারপাশে বনের গায় নৃশংস এক অন্ধকার লেপটে আছে। আসন্ন শীতের ক্ষীণ একটা বাতাসের আভাস কখনো-কখনো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এরি মধ্যে ডানা-ঝাপটে উড়ে-যাওয়া রাত-চরা পাখির অদ্ভুত ডাক নিঝুম সময়কে চমকে দিয়ে যাচ্ছে।

হাতের কাছে টর্চ আর বন্দুকটা রেখে প্রদোষ চৌধুরী পাইপ ধরালেন। এখন নিজেকে বড়ো ক্লান্ত মনে হচ্ছে তার। তাঁবুর গভীর অন্ধকারে ডুবে থাকতে ভারি ভালো লাগছে। একটুখানি খুলে রাখা পর্দার ফাঁক দিয়ে বনভূমির অন্ধকার শরীরের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন প্রদোষ চৌধুরী।

ব্রাণ্ডি-ভেজানো সুগন্ধি তামাকের ধোঁয়া তার স্নায়ুতে অলস শৈথিল্য এনে দিচ্ছে। তার মনের মধ্যে প্রবহমান ভাবনারা জলের স্রোতের মতো পাঁক খেয়ে বয়ে যাচ্ছে। সেই পাক-খাওয়া ভাবনার মাঝে মণিক কাঞ্জিলাল যেন একটা দ্বীপের মতো জেগে আছে।

পাহাড়ের ওদিকে কোথায় সম্বর ডেকে উঠল।

কান পাতলেন প্রদোষ চৌধুরী।

নির্জনতার ষড়যন্ত্র খান খান করে আবার ডেকে উঠলো সম্বরটা। কান পেতে শুনলেই বোঝা যায় ভয় পেয়েছে। অরণ্যের এই সব পাহারাদারেরা ভয় পেলেই ডেকে ওঠে। সেই ডাক শুনে অন্য প্রাণীরা সতর্ক হয়ে যায়। তারা বুঝে নিতে পারে জঙ্গলের নির্মম ঘাতক শিকারের আশায় চলাফেরা সুরু করেছে।

কয়েকবার ডেকে সম্বরটা থেমে গেল।

তারপরই পাহাড়ের উপরের দিক থেকে বাঘের গর্জন ভেসে এল। শীতল একটা ত্রাস অন্ধকারের সঙ্গে মিলেমিশে আরো ভয়াবহ হয়ে উঠল।

না, গর্জন নয়। এ ডাকে কাউকে ভয় পাওয়ানোর কোন চেষ্টা নেই।

একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর বাঘ কি বাঘিনী ডাকতে-ডাকতে পাহাড় থকে নামছে।

হঠাৎ অন্যদিক থেকে আর একটা সাড়া দিল।

গর্জন ও প্রতিগর্জনে নিথর অন্ধকারের পর্দাটা কেঁপে উঠতে থাকে নভূমির আর সাড় নেই। ঝিঁঝিঁ পোকাদের ডানায় যে অতন্দ্র গান বজে উঠেছিল কখন যেন তা থেমে গেছে।

হাতের কাছে রাখা বন্দুকটার স্পর্শ একবার অনুভব করে বাইরের দিকে সজাগ চোখ রাখলেন প্রদোষ চৌধুরী।

আমলকী গাছের ছায়ায় নদীটা যেন মুছে গেছে। তবু ডালপালা-াতা-পত্তরের ফাঁক-ফোকর দিয়ে তারা-ভরা আকাশ কালো জলে ছায়া ফলেছে। কালো জলের সচল ধারাকে ভারি অদ্ভুত লাগছে এখন!

হয়তো কাছাকাছি নেমে এসেছে ঘাতকটা। দুজ্ঞেয় চরিত্রের সেই ানোয়ারটা যতক্ষণ ডাকছিল ততক্ষণ তার সম্পর্কে ভয়ের কোন কারণ ল না। ডাক থামাতেই তার গতিবিধি অরণ্যের অন্ধকারে ঢাকা ড়ে গেছে। এখন তাকে নিয়ে ভয়ের যথেষ্ট কারণ আছে! সেই চতুর নরখাদকটি এখন যে কোন অভিসন্ধি মনে নিয়ে এগোচ্ছে তা ানবার কোন উপায় নেই।

তবে মনে হয় সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সঙ্গসুখের আকাঙ্ক্ষা তাকে চালিয়ে ায়ে বেড়াচ্ছে। আর সেই সাধ যতক্ষণ না মিটবে এলাকার মানুষ তক্ষণ খানিকটা নিরাপদে থাকবে। এই রকম একটা আন্দাজ নিয়ে াত ঘড়ির দিকে তাকালেন প্রদোষ চৌধুরী। অন্ধকারে রেডিয়াম ায়াল জ্বলজ্বল করছে। সবে রাত দশটা।

এরই মধ্যে বনভূমির আঙিনায় নিশুতরাতের প্রহর জাঁকিয়ে সেছে। বনের আর্দ্র বাতাসে কনকনে একটা আভাস শিউরে দিয়ে চ্ছে। কখনো বনভূমির অলৌকিক সুগন্ধ মৃদু নিঃশ্বাসের মতো গায়ে খ পড়ছে।

নড়ে চড়ে বসলেন প্রদোষ চৌধুরী। আজ রাতে ঘুমোন ঠিক হবে না। অস্থায়ী এই বসতির দিকে নরখাদকটার নিশ্চয়ই নজর আছে।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল প্রদোষ চৌধুরীর চোখ দুটো। নদীর ওপারে অন্ধকারের মধ্যে কি যেন একটা এগিয়ে আসছে। গাছের ছায়ায় এখনো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। হাত বাড়িয়ে বন্দুকটা তুলে নিলেন। জন্তুটা গাছের ছায়ার অন্ধকার থেকে এদিকে আসছে না। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে তার মনে হল, একটা গুলবাঘা। অত্যন্ত সাবধানে এগোচ্ছে। এক-একবার মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সন্দিগ্ধ চোখে এপারের দিকে তাকাচ্ছে। বন্দুকটা হাতে তুলে নিয়ে আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন প্রদোষ চৌধুরী। বুঝতে অসুবিধে হয় না, এই সেই গুলবাঘাটা। কয়েকদিন তক্কে তক্কে থেকে আজ অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে স্যানসিকে তুলে নিয়ে গেছে।

নিষ্ঠুর একটা ইচ্ছে তার মনের মধ্যে ঝলসে ওঠে। বন্দুকের নলট তুলে অপেক্ষা করেন প্রদোষ চৌধুরী। গুলবাঘাটা এখনো রেঞ্জের মধ্যে আসে নি। হয়তো আরো একটু অপেক্ষা করতে হবে। জলের কাছাকাছি এলে একটু এগিয়ে গিয়ে একটা অব্যর্থ বুলেটে ভবলীল সাঙ্গ করে দেওয়া যাবে গুলবাঘাটার।

তাঁবুর গায় লেপটে দাঁড়িয়ে গেলেন প্রদোষ চৌধুরী। চরম মুহূ এগিয়ে আসছে। পল-বিপলের হিসেবে এখন সময় কাটছে
কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বন্দুকের নল থেকে অব্যর্থ একটা মৃত্যু ছুটে যাবে

হঠাৎ পিছনে খশখশে একটা আওয়াজ হতে মুখ ফেরালেন চৌধুরী।

ওঃ, আপনি এখানে দাঁড়িয়ে চৌধুরী সাহেব!

সাড়া না দিয়ে দিয়ে নদীর ওপারে চোখ ফেরালেন প্রদোষ চৌধুরী

ঈস্। চারদিকে চোখ ফেলে গুলবাঘাটার পাত্তা পাওয়া গেল না

কি হল?

বন্দুকের নলটা নামিয়ে নিলেন প্রদোষ চৌধুরী, যা হল তাতে হ্যানসির হত্যাকারী রেহাই পেয়ে গেল। আপনি আর পঞ্চাশ সেকেণ্ড পরে এলেও ওর বিকেল বেলার নষ্টামির শোধ নিতে পারতাম। সে সুযোগ আর কোন দিন হবে না হয়তো—

অন্ধকার তাঁবুর দরজায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মণিকা কাঞ্জিকাল।

ভেতরে আসুন মিসেস কাঞ্জিলাল।

আলো জ্বালান নি?

জ্বালানোই ছিল। একটু আগেই নিভিয়ে দিলাম।

কেন?

ভেবেছিলাম, সারা রাত জেগে পাহারা দেব। তা আপনি আবার রাতে তাঁবুর বাইরে এসেছেন কেন?

ভাল লাগছিল না। ন্-না না। শুধরে নিলেন মণিকা কাঞ্জিলাল, ঘুম আসছিল না।

একটু সময় চুপ করে থেকে প্রদোষ চৌধরী বললেন, নারী অবধ্য এরকম একটা রীতি মানুষের সমাজে চলে বটে—বনের জানোয়ার এরকম রীতিনীতি মানে বলে শুনি নি। আপনার মতো বেপরোয়া মহিলার ভাগ্যে বোধ হয় হ্যানসির পরিণতি লেখা রয়েছে। কি-রকম-একটা হাসি যেন প্রদোষ চৌধুরীর মুখে ফুটে ওঠে।

খিল খিল করে হেসে ওঠে মণিকা কাঞ্জিলাল, আপনি বড্ড রেগে যান চৌধুরী সাহেব!

রাগের কথা নয় মিসেস কাঞ্জিলাল; কিছু একটা ঘটে গেলে বিনয়ের কাছে মুখ দেখাতে পারব না। যে জানোয়ারটাকে আমরা এখনো চোখে দেখিনি—সে কিন্তু সারাক্ষণ আমাদের নজরে রেখেছে। শুধু একটুখানি সুযোগের ওয়াদা—শিকার মুখে নিয়ে পলকের মধ্যে উধাও হয়ে যাবে। তখন শুধু একটা কাজই করতে পারব সেটা আফশোষ।

চৌধুরী সাহেব আলোটা জ্বালুন তারপর আপনার কথার উত্তর দেব।

এত শান্ত মানুষ আপনি—রেগে গেলে আপনাকে কেমন দেখায়, ভারি ইচ্ছে করছে দেখতে।

অন্ধকার তাঁবুর মধ্যে প্রদোষ চৌধুরীর কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

একটু পরে দপ করে আলো জ্বলে উঠল।

আমি বসছি। একলা যাওয়া তো আর ঠিক হবে না। আপনাকেই এগিয়ে দিতে হবে। সেটা রাগ পড়বার আগে কিছুতেই হবে না বুঝতে পারছি। মিষ্টি করে একটু হাসেন মণিকা কাঞ্জিলাল।

ইতিমধ্যে নিভে যাওয়া পাইপটা ধরিয়ে নিতে-নিতে প্রদোষ চৌধুরী অসহায় হয়ে বলেন, আপনার সঙ্গে দেখছি পেরে ওঠা যাবে না।

আবার হাসেন মণিকা কাঞ্জিলাল, মেয়েদের কাছে হার মানতে জানা একটা আর্ট চৌধুরী সাহেব। রহস্যময় চোখদুটোকে নিষাদের তীরের মতো ধারালো করে তাকান মণিকা কাঞ্জিলাল।

মিসেস কাঞ্জিলাল। একটু থামলেন প্রদোষ চৌধুরী, আপনার উপস্থিতি আমার মনযোগকে বারবার ভেঙে চুরে দিচ্ছে।

তার মানে।

আপনি জানেন যে জানোয়ারটাকে আমরা মারতে এসেছি সেটা এই এলাকার দরিদ্র মানুষদের পক্ষে বিশেষ বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ-খেকোরা যেমন চালাক তেমনি কৌশলী হয়। বুদ্ধিতে মানুষের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে চলে। তাকে মারার অনেক চেষ্টা আগে ব্যর্থ হয়ে গেছে। এবারের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি না নিজেকে একটু সামলে রাখেন—

সরি, চৌধুরীসাহেব সরি। আসলে ব্যাপারটা কী জানেন, শহরের মানুষ এমন করে কখনো তো নিঃসঙ্গ থাকি নি। মানুষের সঙ্গ আমার ভালো লাগে। আপনার বন্ধুটি থাকলেও কথা ছিল। জঙ্গলে এসে তার পাত্তাও পাচ্ছি না। চাকর-বাকরদের সঙ্গে তো মেশা যায় না। আপনার সঙ্গটা তাই লোভনীয় হয়ে হাতছানি দেয়। ঘুমুতে চেষ্টা করি, তাঁবুর মধ্যে একলা শুয়ে কিছুতে ঘুম আসতে চায় না। তাঁবুর

ফাঁক দিয়ে দেখি আপনার এখানে আলো জ্বলছে। তখন বুঝি আপনি জেগে আছেন। নিজেকে আর সামলাতে পারি না। চৌধুরীসাহেব বাঘের ভয় তখন আর ভয় দেখাতে পারে না। ইচ্ছে করে আপনার পাশে বসে অন্ধকার রাতকে গেলাসে ভরে চুমুক দি—

দুঃখিত।

আমার জন্যে দুঃখিত হবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। তার থেকে আপনার বোতলটা আনুন। গ্লাসে ঢেলে একটু খাই—রাতে কি জানি কিসের যন্ত্রণা যেন বড্ড বাড়ে।

ইতস্তত করেন প্রদোষ চৌধুরী।

কাচ-ভাঙা শব্দের মতো একরাশ হাসি মণিকা কাঞ্জিলালের গলার মধ্যে ভেঙে চুরে ছড়িয়ে যায়, চৌধুরীসাহেব ভয় পাচ্ছেন ?

না, মানে—। প্রদোষ চৌধুরী ঠিক উত্তর দিতে পারেন না।

মণিকা কাঞ্জিলাল উঠে বেতের ঝাপি থেকে স্কচ হুইস্কি ও কাট-গ্লাসের পাত্র নিয়ে বললেন, এখানে এসে বসুন চৌধুরীসাহেব। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তো আর কথা বলা যায় না—না কি বলেন ?

প্রদোষ চৌধুরী যেন কোন দুর্দান্ত বাঘিনীর পাল্লায় পড়েছেন। দারুণ একটা ভয় তাকে চেপে ধরে।

কুঁজোর ওপর থেকে গেলাসটা আনুন না। প্রদোষ চৌধুরী যাবার আগে মণিকা কাঞ্জিলাল নিজে গিয়ে গেলাস তুলে এনে খানিকটা হুইস্কি ঢেলে দিয়ে বললেন, আর দেব ?

না থাক।

সোডা আছে না ফুরিয়েছে ? কাঁচা খেলে বড্ড গলা জ্বালা করে আমার।

প্রদোষ চৌধুরী উঠে গিয়ে দুটো সোডার বোতল নিয়ে এলেন। বিনয় কাঞ্জিলাল এখানে এসে পাঠিয়েছিলেন। তেমনি পড়ে আছে। জঙ্গলে এসে বিলিতি এই পানীয়ের দরকারও পড়ে নি। মনেও ছিল না। তাছাড়া প্রদোষ চৌধুরী মানেন, একটা সাংঘাতিক জন্তুর সঙ্গে

লড়াইয়ে এতটুকু বেসামাল হবার ঝুঁকি নেওয়ার অর্থ কঠিন মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকা।

কর্ক-ওপেনার দিয়ে সোডার বোতল খুলে দিলেন প্রদোষ চৌধুরী,

নিন—।

আপনি ?

এই তো নিচ্ছি।

দুজনে গেলাস ঠেকিয়ে চুমুক দিলেন।

গেলাসে চুমুক দিয়ে মণিকা কাঞ্জিলালের টুকটুকে পাকা সিলাসির মতো টসটসে লাল ঠোঁট উলটে বললেন, ডাচ্‌ প্রবাদে বলে, মেয়েরা দুটো জিনিস খোঁজে, খাবার আর মনের মানুষ। মণিকা কাঞ্জিলাল আরেকবার সিপ্‌ করে নিলেন, কেউ পায়। কেউ পায় না। না-পেলেও কি সকলে মুখ ফুটে বলতে পারে।

বললে ক্ষতি কি ?

ভারি দুটো চোখে মেদুর মোহ এনে তাকান মণিকা কাঞ্জিলাল, বলবে কাকে—মেয়েদের তো বলা যায় না—আর দশজন পুরুষের মধ্যে ন'জনই মেয়ে। তেমন পুরুষের দেখা তো সহজে মেলে না। ক্ষতিটা তাই মেয়েদের মনে-মনে বয়ে বেড়াতে হয়।

গ্লাসের সবটুকু নিঃশেষ করে তাকালেন মণিকা কাঞ্জিলাল। তার অলস ঠোঁট দুটোতে রহস্যময় একটা হাসি ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে।

হুইস্কির বোতল থেকে আরেকটু ঢেলে নিলেন, আমার বড্ড অল্পেতে নেশা হয় চৌধুরীসাহেব। তবু আরেকটু খাই—স্যানসিকে বড্ড ভালোবাসতাম।

হাতের গেলাসটা নামিয়ে প্রদোষ চৌধুরী স্বগতোক্তির মতো উচ্চারণ করলেন, অনেক রাত হয়ে গেল।

সাড়া না-দিয়ে মণিকা কাঞ্জিলাল গেলাসের তলানিটুকু নিঃশেষ করলেন ধীরে-সুস্থে।

তার সামনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন প্রদোষ চৌধুরী।

আঃ। হাই তুললেন মণিকা কাঞ্জিলাল, অনেক রাত হল তাই না চৌধুরীসাহেব। এবার উঠতে হবে।

প্রদোষ চৌধুরীর নিজেকে বড়ো বিব্রত মনে হয়। এই মহিলার হাত থেকে একটু রেহাই চান। রাত এখন নিঝুম। এই মুহূর্তে এই অস্থায়ী বসতির মানুষগুলোর নিরাপত্তার জন্যে বাইরের দিকে নজর রাখা দরকার।

হাতটা একটু ধরবেন। উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করেন মণিকা কাঞ্জিলাল। খেলে এই এক মুশকিল নিজের ওপর কন্ট্রোল থাকে না।

বন্দুকটা তুলে নিলেন প্রদোষ চৌধুরী, চলুন—। হাতটা এগিয়ে দিলেন মণিকা কাঞ্জিলালের দিকে।

চোখ বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন মণিকা কাঞ্জিলাল।

প্রদোষ চৌধুরী তার হাতটা ধরলেন।

তাঁবুর বাইরে বেরুতেই কনকনে একটা ঠাণ্ডা হিংস্র শ্বাপদের মতো ঝাপিয়ে পড়ল।

অর্জুন গাছের পাতায় শিশিরের ফোঁটা টুপটাপ। টুপটাপ।

পেট্রোম্যাক্স নিভু-নিভু হয়ে এসেছে।

সেই আবছা আলো অন্ধকারে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন প্রদোষ চৌধুরী। চারদিকে সজাগ চোখ ফেলে বললেন, মিসেস কাঞ্জিলাল, আমার হাতটা ছেড়ে কাঁধে হাত রাখুন। বন্দুকটা রেডি রাখা দরকার।

হাত ছেড়ে মণিকা কাঞ্জিলাল প্রদোষ চৌধুরীর পিঠের ওপর ভেঙে পড়লেন। তার বুকের মানচিত্রে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড় দুটো ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যেতে লাগল।

জোয়ারের টান যেমন সমুদ্রের লোনা জলকে নদীর খাতে ঠেলে দেয় এই আকস্মিকতা প্রদোষ চৌধুরীকেও কোথায় বুঝি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল।

সেই মুহূর্তে তাঁবুর দরজায় পৌঁছে গেলেন প্রদোষ চৌধুরী, মিসেস কাঞ্জিলাল এসে গেছি।

উঁ। ঘুমের ভেতর থেকে সাড়া দিলেন মণিকা কাঞ্জিলাল।

এসে গেছি।

থ্যাঙ্ক য়ু। টলতে-টলতে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে গেলেন মণিকা কাঞ্জিলাল।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে ফিরলেন প্রদোষ চৌধুরী। কয়েক পা এগিয়েছেন এমন সময় কানে এল, চৌধুরীসাহেব—

ফিরলেন প্রদোষ চৌধুরী।

তাঁবুর সামনে এসে দঁড়িয়েছেন মণিকা কাঞ্জিলাল।

আমাকে ডাকছেন ?

হ্যাঁ।

কেন ?

একটা কথা জিজ্ঞাসা করতাম। মণিকা কাঞ্জিলালের চোখ দুটো হীরের মতো জ্বলছে।

বলুন।

আমার ভারি জানতে ইচ্ছে করে, আপনার বুকের কোনখানে হৃদয়টাকে লুকিয়ে রেখেছেন ?

বিমূঢ় হয়ে কিছু-একটা উত্তর দিতে গিয়ে প্রদোষ চৌধুরী দেখেন, মণিকা কাঞ্জিলাল পর্দার আড়ালে সরে গেছেন।

নিজের সুইস কটেজ তাঁবুর দিকে ফেরবার সময় হাঁক দিলেন প্রদোষ চৌধুরী, শের সিং হুশিয়ার হো—

জী সরকার।

সশস্ত্র পাহারাকে উসকে দিয়ে তাঁবুতে ফিরে প্রদোষ চৌধুরীর নিজেকে ভারি ক্লান্ত মনে হল।

কতো রাত এখন কে জানে। ঘড়িটা আর দেখতে ইচ্ছে করল না।

সারারাত পাহারা দিয়ে ভোর রাতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন প্রদোষ চৌধুরী। ঘুম ভাঙল মানুষ জনের উত্তেজিত কথা বার্তায়। উঠে গিয়ে তাঁবুর ভেতরে দাঁড়িয়ে দেখলেন, কয়েকজন দেহাতি মানুষ। তাঁরা হাত নেড়ে কী বলছে। তাদের ঘিরে চাকর-বাকর, পাহারাদাররা দাঁড়িয়ে আছে।

প্রদোষ চৌধুরীকে দেখে এগিয়ে এসে সেলাম দিল মানুষগুলো। তাদের কাছ থেকে জানা গেল, তারা রাঁচির ওদিক থেকে একপাল মোষ নিয়ে বরহির দিকে যাচ্ছিল। রামগড় পাহাড়ের কাছাকাছি আসতে সন্ধ্যে হয়ে গেছিল। তাদের ইচ্ছে ছিল, পথের ধারে কোন ফাঁকা মাঠে আগুন জ্বেলে রাত কাটাবে। সেই রকম ব্যবস্থাও তারা করেছিল। সেই সময় জনাকয়েক কাঠুরে তাদের খবর দেয়, জায়গাটায় নাকি বাঘের ভয় আছে। সে-জায়গা থেকে বের হতে রাত হয়ে গেল কেননা ইতিমধ্যে তারা রান্না চড়িয়ে দিয়েছিল। খেতে-করতে তাদের রাত বেশ অনেকখানি গড়িয়ে গেছিল।

রামগড় পাহাড় ছাড়িয়ে মাইল দুই নিচে নেমে ছিল তারা। সেই সময় মোষের দল থমকে দাঁড়িয়ে গেল। প্রথমে তারা ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি। শ'খানেক মোষের প্রকাণ্ড দল, সঙ্গে দশ-বারো জন তাগড়া জোয়ান—বাঘের হানা দেবার সাহস হবে এটা তাদের মাথায় আসে নি।

প্রদোষ চৌধুরী জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের সঙ্গে মশাল ছিল না?

একজন জবাব দিল, ছিল জ্বালানোর দরকার হয় নি হুজুর। এই পথ দিয়ে আমরা কতোবার মহাজনের গরু-মোষ নিয়ে গেছি। পথ আমাদের চেনা। অন্ধকার রাতেও আমাদের অসুবিধে হয় না। তা ছাড়া মশাল হাতে নিয়ে অতগুলো মোষ সামলানো সহজ নয়।

মোষেরা থেমে যেতে আমরা ভাবলাম জানোয়ারের খেয়াল। পথে যেতে মাঝে-মাঝে তাদের এমন বেয়াড়াপনা সামাল দিতে হয়। আমরা

সবাই তাই হাঁক-ডাক করে তাদের চালাতে গেলাম। মোষেরা দেখলাম উত্তেজিত হয়ে গায়ে গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গেল।

তখনই বুঝলাম জঙ্গলের ভয়ঙ্কর জানোয়ার আশপাশে হানা দিয়েছে। চারধারের অন্ধকারে কিছু নিশানা করা যায় না। জানোয়ারের সাকিনও আন্দাজ করা কঠিন। তাই নিজেদের সামলাতে ব্যস্ত হয়ে মোষের দঙ্গলে গা-ঢাকা দেবার চেষ্টা করলাম। সেই সময় আমলকীগাছের আড়াল থেকে হিংস্র গরগর আওয়াজ পেলাম।

তখন আর বুঝতে অসুবিধে নেই আমরা ভয়ঙ্কর এক জানোয়ারের পাল্লায় পড়েছি আর সহজে তার হাত থেকে রেহাই নেই।

হুজুর জঙ্গলের পথ ধরে আমরা হামেশাই যাতায়াত করি। সহজে ভয় পেলে আমাদের চলে না। তাহলে রুজি-রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে। মহাজনের খাটালে গরু-মোষ তুলে তবে কথা।

ইতিমধ্যে আমাদের লোকজন মশাল জ্বালিয়ে ফেলতে পেরেছিল। সেই-মশাল হাতে নিয়ে আমরা মোষদের বাঁচাতে চেষ্টা করলাম। ইচ্ছে ছিল, মোষ নিয়ে আমরা এগিয়ে সামনের কোন মাঠ-টাঠ দেখে রাত কাটাবার ব্যবস্থা করব। এদিকে মোষগুলো এগোতে চায় না। তারা ফুঁসছে। ভোঁস-ভোঁস করে নিশ্বাস ফেলছে। যেগুলো পাশে ছিল সেইগুলো মাথা নিচু করে রুখে দাঁড়িয়েছে—বেপরোয়া ভাবে শিং বাগিয়ে মাথা ঝাঁকাতে লেগেছে।

আমরা আশা করছিলাম, জানোয়ারটা যে কোন মুহূর্তে ঝাপিয়ে পড়বে।

তবে বোধ হয় আমাদের সকলের সোরগোলে জানোয়ারটা ফিরে গেল।

এতক্ষণ নিঃশব্দে শুনছিলেন প্রদোষ চৌধুরী। এবার স্বগতোক্তি করলেন, এটা বোধ হয় অন্য বাঘ। খিদের তাড়ায় এগিয়ে ছিল শেষে আগুন আর মানুষ দেখে ভড়কে ফিরে গেছে। মানুষ-খেকো হলে এত সহজে রেহাই দিত না। যাই হোক—। নিজের ভাবনা থেকে হঠাৎ

বুঝি জেগে উঠলেন প্রদোষ চৌধুরী, তা তোমাদের কিসের দরবার করতে আসা ?

দেহাতি মানুষদের একজন বলল, হুজুর আমরা গরীব মানুষ পালামৌ জেলা থেকে দুধেল গরু-মোষ নিয়ে এই পথ দিয়ে যাতায়াত করি। মহাজনের ঘরে পৌঁছে দিলে তবে পয়সা পাই। পথে যদি এমনি জানোয়ারের ভয় হয় তবে মহাজনের গরু-মোষ আনা-নেওয়া বন্ধ হয়ে যাবে আর আমাদের পেটে হাত পড়বে। তাই হুজুর জানোয়ারটাকে যদি খতম্ করেন তবে আমরা বাঁচি।

এখানকার খবর তোমাদের কে দিল ?

হুজুর পথ-চলতি এক রাহী আমাদের আমাদের বলল যে, জঙ্গলের বড়ো সাহেব এখানে ডেরা বেঁধেছেন তাকে জানাতে ; তাহলে হয়তো মুশকিল আসান হতে পারে।

প্রদোষ চৌধুরী উঠলেন, বড়ো সাহেব এখন শহরে আছেন। তিনি এলে তাকে জানাব।

সেলাম জানিয়ে লোকগুলো চলে গেল।

লোকগুলো চলে যাবার পর প্রদোষ চৌধুরী বিনয় কাঞ্জিলালের তাঁবুর দিকে অলস পায় এগোলেন।

মিসেস কাঞ্জিলাল।

চা রেডি। ভেতরে আসুন।

তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে প্রদোষ চৌধুরী হাসলেন। মিসেস কাঞ্জিলাল আপনি কী মানুষের মনের কথা জানতে পারেন।

কেন বলুন তো ?

চায়ের স্পৃহায় সত্যি চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম। হঠাৎ ভিতরে চোখ ফেলে প্রদোষ চৌধুরী অবাক হয়ে গেলেন, আরে বিনয় দেখছি এসে গেছে।

হ্যাঁ, শেষ রাত্রের দিকে গাড়ি ওকে পৌঁছে দিয়ে গেল।

আমি তো লোকগুলোকে বলে দিলাম, বড়ো সাহেব এখানে নেই।

শুনলাম। ইচ্ছে করেই জানাই নি। সারা রাত জেগে ক্লান্ত হয়ে ফিরেছেন তাই জাগাতে ইচ্ছে হল না।

ভালো করেছেন।

ভেতরে আসুন। আর দেরি করলে চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

বসতে গিয়ে প্রদোষ চৌধুরী অকারণেই বললেন, সকালের আবহাওয়াটা ভেরী প্লেজান্ট।

হ্যাঁ, সাড়া দিলেন মণিকা কাঞ্জিলাল, ঠাণ্ডাটা পড়তে-না-পড়তে হঠাৎ কমে গেল।

শীতের বাড়াবাড়ি আমার একদম সহ্য হয় না। চায়ে চুমুক দিলেন প্রদোষ চৌধুরী, মাঝামাঝি রকমের আবহাওয়াটাই আমার সব চেয়ে ভালো লাগে।

এই ভালো লাগার ব্যাপারটা বড়ো বিচিত্র চৌধুরীসাহেব। একজনের ভালো লাগা আরেকজনের খারাপ লাগা—তাই না?

প্রদোষ চৌধুরী উত্তর না দিয়ে হাসলেন। ততক্ষণে তার চা খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। বললেন, বিনয় উঠলে ওকে আমার তাঁবুতে পাঠাতে পারেন বা খবর দিলে আমিই এসে যাব।

আজ সারাদিন কি তাঁবুতে থাকবেন?

সারাদিন থাকব কিনা বলতে পারছিনে। তবে বন্দুকটা একটু খুলে সাফ-সুতরো করে নেব।

তারপর?

ভেবেছি, বনমোরগের আস্তানার খোঁজে পাহাড় চত্বরে হাঁটাহাঁটি করব। চলি মিসেস কাঞ্জিলাল।

নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন প্রদোষ চৌধুরী। তবু একটু এগিয়ে তাকে থামতে হয়। মণিকা কাঞ্জিলাল গুনগুন করছেন: আমার মল্লিকা বনে প্রথম ধরেছে কলি—

বন্দুক হাতে নিয়ে প্রদোষ চৌধুরী গোটা-আটেক নাগাদ বিনয় কাঞ্জিলালের তাঁবুর দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

গতকাল বিনয় কাঞ্জিলাল ক্লান্ত ছিলেন তাই বের হতে পারেন নি। প্রদোষ চৌধুরী একলাই বাঘের সন্ধানে বন-বাদাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। আজ সকালে দুজনের একসঙ্গে বের হবার কথা। বিনয় কাঞ্জিলাল প্রদোষের রিপোর্ট পেয়ে বলেছেন, সব দিকেই ঢুঁড়ে দেখা গেল প্রদোষ মানুষ-খেকোটার আস্তানার সন্ধান পাওয়া গেল না। আমার মনে হয় গড়-পাহাড়ির পিছনে যে পাহাড় আছে তার ওপাশে একবার কাল সকালে বের হওয়া যাবে। তুমি কি বলো?

গুড্ প্রোপোজাল।

সকালে নিজের তাঁবুতে বসে হেভি ব্রেকফাস্ট সেরে উঠে এসেছেন। বিনয় কাঞ্জিলাল অবশ্য বারবার তার সঙ্গে বসতে বলেছিলেন।

প্রদোষ চৌধুরী সবিনয় প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, ক্রৌঞ্চ-মিথুনের রমণীয় মুহূর্তে বারবার নিষাদের ভূমিকা নিতে চাই না ভাই।

আঃ চৌধুরী থামো। বুড়ো বয়সে ওসব আর মানায় না।

মৃদু হেসে চলে এসেছিলেন প্রদোষ চৌধুরী।

এখন তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে বিনয়কে ডাকতে তার কি রকম সঙ্কোচ বোধ হল। তাঁবুর নিভৃত অন্ধকারে মৃদু মন্থর সংলাপ কখনো গানের মতো বেজে চলেছে।

ফিরে এলেন প্রদোষ চৌধুরী। নিজের তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে একজন পাহারাদারকে ইশারা করে ডেকে বিনয়ের তাঁবুতে খবর পাঠালেন, বেরোবার সময় হয়ে গেছে।

বিনয় কাঞ্জিলাল জানালেন, সাহেবকে এগোতে বলো— আমি আসছি।

মুহূর্ত দেরি না করে প্রদোষ চৌধুরী আমলকী বনের আবছা কুয়াশা

জড়ানো ছায়ার ভিতরে নেমে গেলেন। কি যেন একটা ভাবনা অচিন পাখির মতো বারবার উড়ে এসে আনমনা করে দিচ্ছে। জীবনের স্বাদ-গন্ধ থেকে নির্বাসিত এক আত্মা বলে মনে হচ্ছে তাকে। নীল পদ্মের গন্ধের মতো জীবনের সৌরভ তাকে আনচান করে তুলেছে। সেই বঞ্চনার হিসেব-নিকেশ করতে গিয়ে মনে হচ্ছে বাকি পরমায়ুর বদলে যদি তা' ঠোঁটের কাছে তুলে আনা যেত। বনভূমির নির্জন নীলে সেই পিপাসা হঠাৎ যেন তাকে বিকল করে দিয়েছে!

শুকনো পাতার ওপর খচ্‌মচ্‌ করে আওয়াজ হতে সজাগ হয়ে ওঠেন প্রদোষ চৌধুরী। একটা গিলহারি ভয় পেয়ে গাছের দিকে ছুটছে! তার ছাই-রঙা লেজটা উঁচু হয়ে আছে আর বাতাসের সমুদ্দুরে কিচ্‌কিচ্‌ শব্দের বুদ্‌বুদ ছড়াতে-ছড়াতে যাচ্ছে।

গড়-পাহাড়ির পরেই তিরির খাত। পাহাড়ি এলাকা ঢালু হয়ে নেমে গেছে তারপর গড়-পাহাড়ি ছাড়িয়ে পাহাড়ি পথ আবার এঁকে বেঁকে উঠে গেছে। ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে তার আনাগোনা।

হেমন্তের শিশির পড়ে মাটি ভিজে আছে। ঝরা পাতার আনকোরা ভিজে-ভিজে গন্ধ বাতাসে। গন্ধটা ভারি অদ্ভুত!

সামনের খোলা চত্বরে হলুদ মুর্শিদাবাদী রেশমের মতো রোদ এলিয়ে আছে মাটিতে। তার পাড়ে যেন ছায়ার কলকা।

পাহাড়ের চূড়োর দিকে তাকাতে গিয়ে আকাশে চোখ ফেলে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কুয়াশা কেটে রোদ উঠেছে আর পাহাড়ের মাথায় অনাবৃত আকাশের নীল লাবণ্য যেন ময়ূরের মতো পেখম মেলেছে।

দাঁড়িয়ে গেলেন প্রদোষ চৌধুরী। তারপর পাইপ ধরিয়ে হিসেব করে পা ফেলে নিচে নামতে লাগলেন। মনের সঙ্গে তার একটু বোঝা পড়ার দরকার ছিল। যে-সুখ তাকে ধরা দিতে চেয়েছিল তাকে অস্বীকার করাতে দারুণ এক বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়েছে। সেই অস্বস্তি তাকে অস্থির করে তুলেছে। সমস্ত যুক্তিকে মন অস্বীকার করতে চায়। রক্তে-মাংসে-আকাঙ্খায় যে তৃষ্ণা—যে তৃষ্ণা আত্মায়

নক্ষত্রের মতো অসংখ্য নীল অতৃপ্তির ফুল ফুটিয়েছে তাকে বিমুখ করার জন্যে কৈফিয়ৎ চায়।

ক্ষীণ কণ্ঠে প্রতিবাদ করেন প্রদোষ চৌধুরী, না-না-না। এ অসম্ভব—যেন কার হাত থেকে পালাতে চাইছেন এমনভাবে হাঁটতে শুরু করেন।

নদী পেরিয়ে গড়-পাহাড়ি পার হয়ে জঙ্গলের সীমানায় গিয়ে হাজির হলেন। শক্ত পাথুরে মাটি চারদিকে। তারই ভিতর থেকে প্রাণের রস টেনে বনস্পতিরা মাথা তুলেছে। ঝোপ-ঝাড় লতাগুল্মে হালকা সবুজের বাহারি মেলা। কোথাও একটা দুটো গাঢ় হলুদ ফুলের মিনে।

চারদিকে একবার সজাগ চোখ ফেলে দেখে নিলেন প্রদোষ চৌধুরী। অনুভূতি তাকে সতর্ক করে দিল, এবার তুমি বনের রাজার এলাকায় পা দিচ্ছ। হুশিয়ার হো—

বন্দুক হাতে নিয়ে এ পথে চলা কঠিন। ঝোপঝাড় এমনভাবে পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। বনের কোন কোন এলাকায় ঝোপ-ঝাড় নেই। বনস্পতিদের জনপদ শুধু। ডালে টিয়া পাখির মেলা। ঝাকে-ঝাকে উড়ছে। ডানা ঝাপটাচ্ছে। ডাল থেকে ডালে ওড়া-উড়ি করছে। ট্যাঁ-ট্যাঁ শব্দের বিচিত্র কলরব।

টিয়া পাখির মেলা দেখে থেমে গেলেন প্রদোষ চৌধুরী।

হাজার-হাজার পাখি সবুজ পাখা মেলে উড়ছে, ডানা ঝাপটাচ্ছে, ঝিলমিলে পাতার সমুদ্রে ডুব দিচ্ছে, আর ট্যাঁ-ট্যাঁ শব্দের শায়কে আরণ্যক গাম্ভীর্যকে বারবার আহত করছে। তাদের বেহিসেবী খেয়াল-খুশি নিভৃত এই নিরাপত্তায় শেকল-ছেঁড়া স্বেচ্ছাচারে বাতাসকে উত্তরোল করে তুলেছে।

চৌধুরী। পিছন থেকে এগিয়ে এসে পিঠে হাত রাখেন বিনয় কাঞ্জিলাল, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আর তোমাকে খুঁজে হয়রান হচ্ছি।

চমকে উঠে ফিরলেন প্রদোষ চৌধুরী।

বিনয় কাঞ্জিলালের পিছনে তার সুন্দরী বৌ মণিকা কাঞ্জিলাল।

ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকিয়ে প্রদোষ চৌধুরী বললেন, কিসের খোঁজে বেরুচ্ছি সে কথা তোমার মিসেসকে বলেছ তো ?

তুমি কি বলতে চাইছ আমি বুঝতে পেরেছি চৌধুরী—এমন না-ছোড় হয়ে বায়না ধরল যে না-এনে পারলাম না।

তোমার প্রশংসা করতে পারছি না বিনয়।

সে কথা তুমি একশ' বার বলতে পারো ব্রাদার। তবে মিসেস বললেন, তোমার নাকি আপত্তি নেই।

আমার।

পিছন থেকে সামনে এগিয়ে আসেন মণিকা কাঞ্জিলাল। ঠোঁটে শীতের মরশুমি ফুলের মতো রঙীন হাসি ফুটে উঠেছে, চৌধুরীসাহেব ইচ্ছে করেই বলেছিলাম। ন্যানসি নেই। একা-একা সারাদিন কি করে সময় কাটে বলুন তো।

এসে কিন্তু ভালো করেন নি। জোরদার ধকল সইতে হবে—

পারব কিনা জানি নে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলেন মণিকা কাঞ্জিলাল। কৌতুক তার চোখের কানায়-কানায় পারা লাগানো কাচের মতো ঝকঝক করে, দেখি না একবার পরখ করে।

প্রদোষ চৌধুরী কঠিন দৃষ্টিতে মণিকা কাঞ্জিলালের দিকে তাকিয়ে সামনের দিকে এগোলেন।

সামনে প্রদোষ চৌধুরী। মাঝখানে মণিকা কাঞ্জিলাল। রাইফেল হাতে পিছনে বিনয় কাঞ্জিলাল।

খানিকটা এগিয়ে প্রদোষ চৌধুরী চারদিক তন্ন তন্ন করে দেখে হাত তুলে ইশারা করলে তবে পিছনের দুজন সামনের দিকে পা বাড়ান। ঝোপ-ঝাড় পার হবার সময় সতর্কতা আরো বেশি। জঙ্গলের প্রতি ইঙ্গিতে জিঘাংসা ওৎ পেতে থাকে।

অনেকক্ষণ তিনজনই নীরব।

মণিকা কাঞ্জিলাল এক সময় নীরবতা ভাঙলেন, রাগ পড়েছে

চৌধুরীসাহেব ? উপহার দেবার মতো এক চিলতে হাসি তার ঠোঁটে ফুল হয়ে উঠল।

প্রদোষ চৌধুরী পিছন ফিরে হাসলেন। সাড়া দিলেন না।

তিনজন মানুষের এই দলটা অজগর সাপের মত আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ বেয়ে গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল।

বনভূমির নির্জনতা তাদের গ্রাস করে ফেলল। সেই নিস্তরঙ্গ সবুজ সমুদ্রের রহস্যে ঢাকা নিসর্গপ্রকৃতি অপলক চোখে অনাহূত তিন আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট সংলাপে আলাপচারি হয়ে উঠেছিল বোধহয়।

সকালে কুয়াশা কেটে রোদের তেজ বেড়েছে। বনের ভেতরকার স্যাঁতস্যেঁতে ভাবটা কখন মুছে গেছে।

পথে যেতে যেতে বিনয় কাঞ্জিলাল কখন সামনে এগিয়ে গেছেন। মণিকা প্রদোষ চৌধুরীর গা-ঘেঁষে পথ চলেছেন।

এখনো রাগ পড়েনি ?

না। একটু থামলেন প্রদোষ চৌধুরী, রাগ-টাগ কিছু নয় মিসেস কাঞ্জিলাল।

তবে কথা বলছেন না কেন ?

জঙ্গল অন্যদিকে মন দেওয়া আপদেই বরদাস্ত করে না। আনমনাদের এলাকা এটা নয়।

তাই বুঝি। নীরব হয়ে গেলেন মণিকা কাঞ্জিলাল।

উঁচু-নীচু পথ, খানা-খন্দ পেরিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে সন্দেহজনক ঝোপঝাড় ঘুরে নিরুদ্দেশ এক শিকারের সন্ধানে তারা এগোতে লাগলেন।

একটা খরগোস আর কয়েকটা কাঠবেড়ালি ছাড়া অন্য কিছু সেখানে চোখে পড়ে নি সেখানে ভয় আগলে বেশিক্ষণ থাকা যায় না। মণিকা

কাঞ্জিলালের ভয় ভেঙে গেছিল তাই ইচ্ছে মতো এদিক-ওদিক উঁকি-ঝুঁকি মারতে লাগলেন আর দৌড়ে এসে দলের সঙ্গ নিচ্ছিলেন।

প্রদোষ চৌধুরী দু-একবার সাবধান করে দিলেন, মিসেস কাঞ্জিলাল একবার হারিয়ে গেলে বিনয় কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েও আপনার খোঁজ পাবে না।

জঙ্গলের সামনের দিকটা আরো উপরে গেছে। এত খাড়া যে সোজাসুজি ওঠবার উপায় নেই। অনেক ঘুরে উঠতে হচ্ছে।

খানিকক্ষণ হাঁটবার পর প্রদোষ চৌধুরী হেঁকে উঠলেন, বিনয়—

সাড়া এল গাছপালার আড়াল থেকে, ইয়েস প্লিজ—

তোমার মিসেস কোথায়?

তোমার কাছাকাছিই তো ছিল।

দেখছি না তো।

তাহলে! দ্রুত পায় পিছিয়ে এলেন বিনয় কাঞ্জিলাল।

দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হতভম্ব।

বিনয় কাঞ্জিলাল বিহ্বল চোখে চারদিকে নজর করেও পাত্তা করতে পারলেন না, কি ব্যাপার বলো তো চৌধুরী? ভয়ানক একটা ত্রাস সাপের মতো তাকে পেঁচিয়ে ধরে বুঝি।

কারো মুখে কথা নেই।

ভয়ঙ্কর এক আরণ্যক নির্জনতার তলায় দুজনে চাপা পড়ে গেল বুঝি!

হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠেন বিনয় কাঞ্জিলাল, কিছু একটা ব্যবস্থা করো চৌধুরী।

এক মুহূর্ত ভাবলেন প্রদোষ চৌধুরী, হয়তো কঠিন মূল্য দিতে হবে বিনয়কে। মণিকার অদৃশ্য হয়ে যাবার একটাই কারণ থাকতে পারে। আর সেটাই যদি সত্যি হয় তাহলে ধরে নিতে হবে চিরকালের মতো অদৃশ্য হয়ে গেল মণিকা কাঞ্জিলাল। বিনয়ের এখন যা অবস্থা তাকে নিয়ে ওদিক-ওদিক ঘোরা বিপজ্জনক।

তুমি এখানে দাঁড়াও বিনয়। আমি চারধারটা একবার দেখি খুঁজে। হাতের বন্দুক বাগিয়ে গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন প্রদোষ চৌধুরী। ঝোপঝাড় পাতা-পত্তর গাছের আড়াল ও মাটিতে রক্তের কোন চিহ্ন আছে কিনা তারই খোঁজে জঙ্গল ঢুঁড়তে লাগলেন।

শ্বাসরুদ্ধ করা সাংঘাতিক একটা ভয় হিংস্র ডোরাকাটার মতো জঙ্গলের আড়ালে-আবডালে থাবা উঁচু করে রইল।

বিনয়কে ছেড়ে অনেকখানি চলে এসেও প্রদোষ মণিকা কাঞ্জিলালের কোন পাত্তা করতে পারলেন না। মনে মনে আশ্চর্য লাগছিল, তার সতর্ক চোখের সামনে থেকে কি করে সেই রহস্যময়ী হঠাৎ উধাও হয়ে গেলেন!

ফেরবার পথে হতাশ প্রদোষ চৌধুরী এলোমেলো ভাবে হাঁটতে হাঁটতে নজর করলেন, নিঃসঙ্গ একটি রাঙঝেরি গাছ নভেম্বরের বিষণ্ণ পুষ্পহীন বনভূমিকে থোকা থোকা সোনালি-হলুদ ফুলে ছেয়ে রেখেছে। সেই গাছের একটা ডালের অস্বাভাবিক নড়াচড়া দেখে বন্দুকের সেফটি ক্যাচ তুলে খর পায় এগিয়ে গেলেন।

একটু এগোতে মণিকা কাঞ্জিলালকে সেই গাছের তলায় স্পষ্ট দেখা গেল। এক গোছা ফুলের আশায় একটা ডাল ধরে টানাটানি করছেন।

মিসেস কাঞ্জিলাল। প্রদোষ চৌধুরী মেজাজটাকে শেকলে বেঁধে সামনের দিকে এগোলেন।

জানতাম আপনারা কেউ এদিকে এসে পড়বেন।

বুঝতে পারছি না সেটা কার সৌভাগ্য!

আঃ, আর কথা বাড়াবেন না। এক গোছা ফুল পেড়ে দিন না কী সুন্দর ফুল! কতক্ষণ ধরে চেষ্টা করছি পারছি না।

কথা বাড়ালেন না প্রদোষ চৌধুরী। ডাল নুইয়ে একরাশ রাঙঝেরি ফুল ভেঙে মিসেস কাঞ্জিলালের হাতে দিলেন, এবার চলুন-বিনয় হয়তো ভেবে অস্থির হচ্ছে।

ফুলগুলো বুকে জড়িয়ে আদর করেন মণিকা কাঞ্জিলাল, চলুন যাওয়া যাক—

মণিকা কাঞ্জিলালকে সামনে রেখে এগোতে থাকেন প্রদোষ চৌধুরী।

খানিকটা এগিয়ে মণিকা কাঞ্জিলাল থামলেন, চৌধুরী সাহেব—

বলুন।

এই ফুলের গোছা থেকে কয়েকটা ফুল ভেঙে আমার খোঁপায় গুঁজে দিন না—

কে—আমি!

খিলখিল করে হাসেন মণিকা কাঞ্জিলাল, আর কাউকে তো দেখছি না—

বিনয়ের কথাটা একবার ভাবুন—আপনার জন্যে হা-পিত্যেস করে দাঁড়িয়ে আছে।—তাড়াতাড়ি চলুন—

যাচ্ছি তো। মণিকা কাঞ্জিলালের গলা ছলছল করে, ফুলগুলো দিন না খোঁপায় গুঁজে—

প্রদোষ চৌধুরী এক গোছা ফুল মণিকা কাঞ্জিলালের খোঁপায় গুঁজে দিলেন।

কেমন দেখাচ্ছে আমাকে চৌধুরী সাহেব?

প্রদোষ চৌধুরী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে জবাব দিলেন, কথাটা বিনয়কে জিজ্ঞাসা করলে ভালো হত না মিসেস কাঞ্জিলাল?

সেদিন রাত থেকে আপনি আমার ওপর রেগে আছেন চৌধুরী সাহেব। মণিকা কাঞ্জিলালের চোখে পরিহাস চিকচিক করে।

বিনয় কাঞ্জিলালও এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারেন নি। উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় ছটফট করতে-করতে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে শেষে দুজনের সামনে এসে পড়লেন! মিসেসকে দেখে সামনে ছুটে এলেন আর কোন রকম লজ্জা সরমের বালাই না-রেখে তাকে জড়িয়ে চুমু খেলেন, তোমার কি হয়েছিল ডার্লিং—?

পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। থমথমে গলায় উত্তর দিলেন মণিকা

কাঞ্জিলাল, এবার ছেড়ে দাও—। ইতিমধ্যে আড় চোখে একবার প্রদোষ চৌধুরীকে দেখে নিলেন।

বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে না বিনয়! পরিহাসে তরল প্রদোষ চৌধুরীর গলা।

ও ইয়েস। মণিকাকে ছেড়ে দিলেন বিনয় কাঞ্জিলাল, চলো এগোন যাক—

নভেম্বরের সূর্য ম্লান হয়ে গেল হঠাৎ।

ততক্ষণে তিনজনে জঙ্গল ছাড়িয়ে পাহাড়ের মাথার ওপর চড়েছে।

মেঘ করলো নাকি! স্বগতোক্তি করেন প্রদোষ চৌধুরী।

সাড়া দিল মণিকা, তাই তো দেখছি!

বিনয়ের কাছ থেকে এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য শোনা গেল না। তারা জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে পাহাড়ের সামনের দিকটা খুঁটিয়ে দেখছিল।

অকাল সন্ধ্যার ছায়া বনভূমির মুখে মেদুর বিষণ্ণতা এনে দিয়েছে। অলস একটা ছায়া গালচের মতো বিছিয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে।

বিষ্টি হবে বোধ হয়। ফিসফিস করেন মণিকা কাঞ্জিলাল। আগে বোঝা যায় নি, এখন বোঝা গেল সামনে-ছড়ানো একটা উপত্যকার মুখোমুখি তারা এসে দাঁড়িয়েছেন।

একটু এগিয়ে থেমে গেলেন প্রদোষ চৌধুরী।

উপত্যকার উপরে হেলে-পড়া একটা গাছের ছায়ায় বাঘ আর বাঘিনী। এক জোড়া ডোরাকাটা উজ্জ্বল হলুদ জিঘাংসা।

প্রদোষ চৌধুরী পিছু হঠে এসে প্রায় থাবা মেরে মণিকা কাঞ্জিলালকে বসিয়ে দিল মাটিতে।

ততক্ষণে বিনয় কাঞ্জিলাল তার রাইফেল বাগিয়ে ধরেছেন।

সামনের গাছপালার ঘন আবরু তিনজনের অস্তিত্ব ঢেকে রেখেছে তাই রক্ষে! জঙ্গলের সেই দর্পিত দুই প্রচণ্ড সাহস তাদের অত কাছে মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে তখনো সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে নি। জঙ্গলের দিকে মুখ করে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে তারা।

প্রদোষ চৌধুরী তার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে ইশারা করলেন।

যেটা দাঁড়িয়ে আছে সেটা প্রদোষ চৌধুরীর টারগেট। অন্যটা বিনয় কাঞ্জিলালের।

বন্দুকটা তুলে প্রদোষ চৌধুরী ফিসফিস করে বলেন, বিনয়—রেডি—

রেডি। বিনয় কাঞ্জিলালের ঠোঁট দুটো নড়ে উঠলো আর শব্দটা প্রদোষ চৌধুরীর কানে একটা সঙ্কেতের মতো এসে বিঁধলো আর সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক ও রাইফেলের গুলি মৌমাছির মতো শব্দ করে বেরিয়ে গেল।

পর পর চারটে শব্দ অরণ্যের মসৃণ স্তব্ধতাকে ছিঁড়ে খুড়ে ছারখার করে দিল।

প্রদোষ চৌধুরীর গুলিতে বাঘের কাঁধের হাড় ভেঙে হৃদপিণ্ড ছ্যাদা হয়ে গেল। বাঘটা প্রচণ্ড এক লাফ দিয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল।

ঝোপঝাড়ের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল তার শরীরটা। বিনয় কাঞ্জিলালের গুলি বাঘের গায়ে লাগলো কি ছুঁয়ে গেল কে জানে। বাঘটা ডিগবাজি খেয়ে উলটে গেল তারপর মুহূর্তের মধ্যে উঠে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এদিকে থুবড়ে-পড়া বাঘটা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে গাছপালার উপর গিয়ে পড়ল তারপর হিংস্র আক্রোশে ঝোপঝাড়ের উপর আছড়ে পড়ে দাঁত আর নখ দিয়ে সব কিছু ফ্যালা ফ্যালা করে ফেলতে লাগল। প্রদোষ চৌধুরী আবার একটা গুলি ছুড়ে তাকে ঠাণ্ডা করে দিলেন।

মণিকা কাঞ্জিলালের যেন সাড় নেই। আহত বাঘের গর্জনের দাপট তাকে বোধ হয় অচেতন করে ফেলেছিল। পুতুলের মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। মুখটা কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে।

বিনয় কাঞ্জিলাল তার মিসেসকে জোরে ঝাকুনি দিলেন, কি হল তোমার!

সচেতন হয়ে মণিকা কাঞ্জিলাল বললেন, চলো—এখান থেকে যাই—

ভয় করবেন না মিসেস কাঞ্জিলাল। একটা মারা গেছে। আরেকটা বোধ হয় পালালো।

সিগারেট ধরালেন বিনয় কাঞ্জিলাল, মানুষ-খেকোটা মারা পড়লে ভালো। না হলে ঝঞ্ঝাট ঘাড়ের ওপর চেপে রইল।

তিনজনে কয়েক পা নেমে উপত্যকায় পা দিলেন।

প্রদোষ কাঞ্জিলাল পাথরের কয়েকটা টুকরো তুলে বাঘের গায় ছুঁড়ে মারলেন। ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে পড়ে থাকা বাঘটার কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

মণিকা কাঞ্জিলালকে দাঁড় করিয়ে হাতিয়ার তুলে ছজনে এগোলেন। মাটিতে পড়ে থাকা নিথর দেহটার দিকে তাকিয়ে প্রদোষ চৌধুরী বললেন অল্প বয়স্ক সুস্থ সবল বাঘ। এর পক্ষে মানুষ-খেকো হবার কোন কারণ ঘটেনি। বিনয় কাঞ্জিলালের দিকে তাকিয়ে প্রদোষ চৌধুরী দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, মানুষখাকীটাই পালিয়েছে বিনয়।

তা'হলে ?

সমস্যা যা ছিল তাই আছে।

আমার গুলিটা কি করে মিস করে গেল বুঝতে পারছি না!

কপালে ভোগান্তি থাকলে এরকম হয় আর কি!

হু-হু করে হাওয়া বইছে।

উত্তরের দিক থেকে মেঘের পর মেঘ এসে জমছে।

বনের উপর দিকে একটানা হাওয়া বয়ে গাছপালাকে চঞ্চল করে তুলেছে। শাল সেগুন অর্জুন আমলকী ও রাঙঝেরি গাছের পাতায়— ডালে অসংখ্য অজস্র শব্দ—শব্দের ফুলঝুরি ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেতে লাগলো। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন বিনয় কাঞ্জিলাল, দেখ প্রদোষ, দেখ— আঙুল তুলে দেখালেন, বাঘটা অনেক নিচে তিরির খাত পেরিয়ে ওপারে যাচ্ছে—

প্রদোষ চৌধুরীর যখন চোখ পড়ল তখন বাঘের লেজটা গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে। চোখ ফিরিয়ে বিনয় কাঞ্জিলালের দিকে

তাকালেন, হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে—এলাকার মানুষদের কপালে আরো দুঃখ লেখা আছে!

হঠাৎ কি মনে করে বিনয় বললেন, দাঁড়াও আমি দেখছি। তারপরই পাহাড়ের গা বেয়ে নিচের দিকে নামতে সুরু করলেন।

এই বিনয় কোথায় চললে ? প্রদোষ চৌধুরী দুরন্ত বাতাসে তার গলার স্বর ভাসিয়ে দিলেন, এই বিনয় থামো-থামো—

তোমরা একটু দাঁড়াও। বিনয় কাঞ্জিলালের গলা ভেসে এলো, আমি আসছি।

প্রদোষ চৌধুরী নিচের দিকে ঝুকে পড়ে চেঁচালেন, পাগলামি করো না বিনয়!

বিনয় কাঞ্জিলাল উপরের দিকে মুখ তুলে উত্তর দিলেন, এখনো বেলা আছে দেখি যদি ঘায়েল করা যায়—।

বাতাসের বেগ বাড়ছে। বনভূমির ডালে পাতায় মর্মরিত হয়ে উঠছে দুর্বোধ্য সংলাপ। পাহাড় ও অরণ্যের নির্জনতা ভেঙে পড়ছে। প্রদোষ চৌধুরী ফিরলেন, এবার মিসেস কাঞ্জিলাল ?

বলুন। কেমন যেন আনমনা মনে হয় তাকে।

বাতাসের বেগ যেমন বাড়ছে তাতে তো বেশিক্ষণ পাহাড়ের ওপরে এই উপত্যকায় দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না।

আপনার বন্ধু ফিরে আসা পর্যন্ত তো অপেক্ষা করবেন ?

আবহাওয়া যেমন তাড়াতাড়ি পালটাচ্ছে তাতে একটা আশ্রয় নেওয়া দরকার—হয়তো এখুনি বিষ্টি নামতে পারে ; দিন শেষ হবার আগেই রাত এসে যাবে—

চলুন একটু সরে গিয়ে কাছাকাছি কোন গাছের তলায় দাঁড়াই। প্রদোষ চৌধুরী চারদিকে তাকিয়ে আশ্রয় নেবার মতো একটা গাছের খোঁজ করতে লাগলেন।

চৌধুরী সাহেব।

বলুন।

চোখের সামনে এই মরা বাঘটা আমার কাছে ভারি অস্বস্তিকর মনে হচ্ছে।

তা'হলে চলুন সামনের বড়ো গাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়াই। যেতে যেতে প্রদোষ পিছন ফিরে তাকান, এমন চমৎকার চামড়াটার কোন ব্যবস্থা করা গেল না। অন্ধকার নামলেই শেয়াল হায়েনারা ছিঁড়ে কামড়ে চামড়াটা নষ্ট করে দেবে। তারপর মনে হচ্ছে বিষ্টি নামবেই—চলুন মিসেস কাঞ্জিলাল।

হঠাৎ একমুঠো বিষ্টি কে যেন গায়ের ওপর ছড়িয়ে দিল!

সন্ধ্যে হবার আগে প্রদোষ চৌধুরী মণিকা কাঞ্জিলালকে উপর থেকে নিচে নামিয়ে ছোট-একটা গুহার মতো পাহাড়ের খাঁজে আশ্রয় নিলেন।

আজ রাতে এখানেই কাটাতে হবে মিসেস কাঞ্জিলাল।

আমরা নেমে যেতে পারতাম না?

কি জানি! অন্যমনস্ক হয়ে পাইপ টানতে-টানতে উত্তর দিলেন প্রদোষ চৌধুরী, হয়তো পারতাম। হয়তো পারতাম না। তবে সেটা দারুণ রিস্‌ক্ হয়ে যেত। একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, রিস্‌ক হয়ে যেত—

কেন?

এই দুর্যোগে পথই হয়তো চিনে উঠতে পারতাম না। তাছাড়া পথের মাঝখানে মানুষখেকোটার সঙ্গে দেখা হত না এমন কথা কেউ বলতে পারে!

সত্যি!

এই সত্যির মধ্যে এক ফোঁটা জল মেশানো নেই। অন্ধকার রাতে জল-বিষ্টি আর বাতাসের দাপটের মাঝখানে আমার হাতিয়ারের সাধ্যি কি তাকে ঠেকায়। তার চেয়ে এই ভালো হল মিসেস কাঞ্জিলাল। আমার হাতে যতোক্ষণ হাতিয়ার আছে আমরা দুজনেই নিরাপদ।

শ্লেটের মতো কালো আকাশ থেকে ঝিরঝিরে বিষ্টি পড়ছিল।

সন্ধ্যের মুখোমুখি দমকা বাতাস আর বিষ্টি যেন ঝোঁপে এলো। পাহাড়ের খাঁজে-ফাটলে-খোঁদলে বাতাস আছড়ে পড়ে বুক-চেরা গোঙানির মতো ককিয়ে ওঠে। সারা অরণ্য জুড়ে ভাঙা-চোরা শব্দের ছলচাতুরি কাকে যেন ভয় দেখিয়ে ফিরছে!

আবহাওয়ার পালা-বদল ঘটল।

প্রদোষ চৌধুরী বাইরের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে পাইপ টেনে যেতে লাগলেন।

অন্ধকারে ছায়ার মতো বসে মণিকা কাঞ্জিলাল অপলক চোখ মেলে রইলেন। তার চোখের এপার-ওপার কানায় কানায় অন্ধকারে ভরে উঠেছে। চোখের তারায় বসে থাকা আলোটুকুও এখুনি মুছে যাবে বুঝি! সেই নিরালোক সময়ে ভিতরে-বাইরে চারদিকে অন্ধকার!

একটু পরেই পাহাড়-অরণ্য একেবারে ডুবে গেল। সীমাহীন অন্ধকার জোয়ারের জলের মতো কেঁপে উঠে চোখের বাইরে যতো দূর দেখা যায় সবটুকু ডুবিয়ে দিল।

পাশাপাশি বসে থাকা দুটি মানব ও মানবীর অস্তিত্ব সেই অন্ধকারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। শুধু মাঝে মাঝে প্রদোষ চৌধুরীর পাইপের মুখে গনগনে আগুন এক রহস্যময় ক্রুদ্ধ চোখের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল।

হঠাৎ অন্য গ্রহ থেকে যেন মণিকা কাঞ্জিলালের গলা ডেকে এলো চৌধুরী সাহেব—

অন্ধকারে মুখ ফিরিয়ে প্রদোষ চৌধুরী মণিকা কাঞ্জিলালের অস্তিত্ব অনুভব করতে চাইলেন। গাঢ় নিরেট অন্ধকারের সঙ্গে বুঝি গলে মিশে গেছেন মণিকা কাঞ্জিলাল।

চৌধুরী সাহেব।

বলুন। নড়ে চড়ে বসলেন প্রদোষ চৌধুরী।

কি ভাবছেন?

হেসে ওঠেন প্রদোষ চৌধুরী, ভাবনা টাবনাগুলো সব এখন সিকেয়

তুলে রেখেছি মিসেস কাঞ্জিলাল। দুর্যোগের যা বহর দেখছি তাতে ভেবে কিছু করা যাবে না। এখানে রাত কাটানোর জন্যে মনকে প্রস্তুত করে রেখেছি। দুর্যোগের রাতে এমন একটা আশ্রয় মন্দ কি ?

এই জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকারে রাত কাটান যাবে ?

তা'ছাড়া তো কোন উপায় দেখছি নে। প্রদোষ চৌধুরী গুহার বাইরে মাথা বের করে একবার আকাশের দিকে তাকালেন, আকাশের যা অবস্থা দেখছি তাতে কাল সকালের আগে কোন হেরফের হবে বলে তো মনে হয় না।

মণিকা কাঞ্জিলালের কাছ থেকে একথার কোন উত্তর পাওয়া গেল না শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

প্রদোষ চৌধুরী অন্ধকারে অপলক হয়ে মণিকা কাঞ্জিলালের দিকে তাকিয়ে রইলেন। চোখে তাকে দেখা যাচ্ছে না তবু যেন অনুভবে স্পষ্ট। তার মনের অভিলাষ পথ ছেড়ে বিপথে যাত্রা করছে। পৃথিবী থেকে অনেক দূরে নিভৃত অন্ধকারে এই শরীরী লাবণ্যের স্থিতি তাকে বেপথু করে তুলেছে। অবৈধ একটা ইচ্ছে দুর্বার আক্রোশে তার মনের টুটি চেপে ধরেছে। চুপ করে থাকলে সে যেন আরো পেয়ে বসছে। কতো কালের ফসিল সাধ-আকাঙ্খা দুর্যোগের আড়ালে ঘুম ভেঙে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নির্মম এক প্রতিশোধ নেবার আছিলায় তৎপর হয়ে উঠেছে।

আপনার ভয় করছে না মিসেস কাঞ্জিলাল ?

জঙ্গলে আসার পর এই একটা অনুভূতি সব সময় সতর্ক করে রেখেছে চৌধুরীসাহেব। ভয় আর ভয়। খাওয়া-শোয়া-বসা হাঁটা-চলা সব কিছুর মধ্যে ভয় ছায়া ফেলে রেখেছে। এখানে ঠাঁই নেবার আগে বনের বাঘ ভয় দেখিয়েছে—এখন—

থামলেন কেন ?

ইতস্তত করে মণিকা কাঞ্জিলাল তার কথা শেষ করলেন, এখন মনের বাঘের ভয় দেখাচ্ছে।

মিসেস কাঞ্জিলাল। ইঙ্গিতটা বুঝে নিতে কষ্ট হয়নি প্রদোষ চৌধুরীর তাই তার গলার স্বরে উত্তেজনা প্রকাশ পায়, আপনি কি বলতে চাইছেন?

অঝোর বৃষ্টি নেমেছে আকাশ ভেঙে।

গাছপালার মাতামাতি সারা বনভূমি জুড়ে দুরন্ত এক মত্ততায় উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে। কখনো বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মেঘ ডাকছে। পাহাড়ের গা-বেয়ে সেই শব্দ আছড়ে পড়ে নিচের দিকে নেমে আসছে।

আরো একটু নিচে, তিরির খাতে বিপুল এক জলস্রোত উপছে পড়ে ডাইনির মতো কুটিল হাসি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বয়ে যাচ্ছে। সেই ভাঙাচোরা খরস্রোতা হাসি গাছপালার আড়ালে পথ হারিয়ে পাথরে মাথা কুটে মরছে বারবার।

দমকা বাতাসে জলের ছাঁট আসাতে প্রদোষ চৌধুরী একটু সরে বসলেন তারপর মনিকা কাঞ্জিলালের দিকে তাকিয়ে কি একটা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। অনেকক্ষণ ধরে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে মনের মধ্যে ডুবে রইলেন।

হঠাৎ মনিকা কাঞ্জিলালের কথা শোনা গেল, আজ সকালে বেরোবার সময় ভাবতেও পারিনি সন্ধেবেলা এমন একটা অবস্থায় পড়বো—চৌধুরীসাহেব! সকালে যখন বেরিয়েছিলাম রোদে তাজা ঝকঝকে আকাশ। আর এখন—আশ্চর্য!

হাসলেন প্রদোষ চৌধুরী, আশ্চর্য হবার কি কোন সীমানা আছে মিসেস কাঞ্জিলাল। ধুলোর কণাকে ঘিরে যেমন শিশিরের ফোঁটা জমে, তেমনি জীবনের কোন ঘটনাকে আশ্রয় করে মনের বিস্ময় ঝলসে উঠবে সে কথা কি কেউ বলতে পারে। পাইপে জবরদস্ত টান দিলেন প্রদোষ চৌধুরী। শীতল বাতাসে ব্রাণ্ডি-ভেজানো তামাক পোড়ার মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো, এই ধরুন না, আপনাকে দেখে যে আশ্চর্য হয়, সে কি কারো মানা মানে!

তাতে অবাক হবার কিছু নেই চৌধুরীসাহেব। আমার এই

চেহারাটার পেছনে সুদূর আটলান্টিকের হিংস্র নোনা জলের গন্ধ আছে সে হিসেব যে কেউ কল্পনায়ও আনতে পারে না। আমার নীল চোখ আর গায়ের রঙ দেখে সবাই চমকে যায় কিন্তু রহস্যের থই পায় না। ছ'য়ে-ছ'য়ে চার সবাই মেলাতে পারে। বাইশ হলেই বিপদ!

অন্ধকারে বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকেন প্রদোষ চৌধুরী।

আপনি বোধহয় কিছু বুঝতে পারলেন না চৌধুরীসাহেব?

সত্যি তাই।

মুশকিল আসান করতে গেলে আপনাকে আমার জীবনের কথা শোনাতে হয়। সে কি আপনার ভালো লাগবে?

খুব। এমন নিরুপায় অবকাশে এর চেয়ে উপভোগ্য আর তো কিছু হাতের কাছে পাচ্ছি নে। আপনি শুরু করুন মিসেস কাঞ্জিলাল—

তা'হলে শুরু করি। মিসেস কাঞ্জিলাল মৃদু কণ্ঠে ফিসফিস করেন, আমার দাদামশাইয়ের বাবা মানে আমার মায়ের ঠাকুর্দা জন্মের সূত্রে বোধহয় জারজ। অবৈধ জাতককে ঘরে রাখতে সাহস পায়নি তার মা। রাস্তায় ফেলে রেখে গেছিল। স্কটিশ মিশনারি ফাদার ম্যাকডোনাল্ড তাকে তুলে এনেছিলেন। পথে-ফেলা ছেলেটিকে ব্যাপ্টাইজ করেছিলেন বলে তার পদবী ছেলেটির ওপর বর্তে ছিল। লেখাপড়া তার হয় নি। হবে না বুঝতে পেরে একটা মিশনারি স্কুলের কেয়ার-টেকারের চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন ফাদার। বিয়েটা অবশ্য নিজেই যোগাড়-যন্তর করে ব্যবস্থা করেছিলেন। ধর্মভীরু খ্রীষ্টান ছিলেন। রবিবার সকালে কোট-প্যান্ট-নেকটাই চড়িয়ে আধ-হাত ঘোমটা টানা বৌয়ের হাত ধরে গীর্জেয় হাজরে দিতেন। এই সুধাকান্ত ম্যাকডোনাল্ডের ছেলে মহিম ম্যাকডোনাল্ড আমার দাদামশাই। মিশনের অনুগ্রহে বি. এ. পাশ করেছিলেন। চাকরি পেতেও তার অসুবিধে হয় নি। বাপ-মা বিয়েও একটা দিয়েছিলেন। বিয়ের পর কলকাতায় এসে সংসার পাতলেন।

আমার দাদামশাই ছিলেন মৃদুভাষী। রবীন্দ্রনাথে ছিল আসক্তি। ওল্ড টেস্টামেণ্টের রাজা সলোমনের গান ছিল তার প্রিয়। অশ্বঘোষের বুদ্ধ-চরিতের ইংরাজী অনুবাদ আর দক্ষিণ ভারতের কাব্য শিলাপ্পদি-করণম তার সব সময়ের সঙ্গী।

মেয়ের নাম রাখলেন মৈত্রেয়ী। মায়ের তিন-চার বছর বয়সের সময় দিদিমা মারা যান। মেয়েকে বুকে-পিঠে করে মানুষ করে তুলতে হল তাকে। বাপ আর মেয়ে একটা আলাদা পৃথিবী গড়ে তার মধ্যে বাস করতে লাগলেন।

বি. এ. পড়বার সময় মা জিজ্ঞেস করল, বাবা কি কম্বিনেশন নেব?

দাদামশাই উত্তর দিলেন, অনার্সটা সংস্কৃতেই রাখিস। ভারতবর্ষ বলে যে প্রাচীন দেবভূমি আছে তার আত্মার নির্দেশ আছে সংস্কৃত সাহিত্যে—মনুষ্যত্ব লাভ করতে গেলে তাকে হেলাফেলা করা চলে না।

একদিন কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে মা বলল, বাবা মৈত্রেয়ীর সঙ্গে ম্যাকডোনাল্ড আর বয়ে বেড়াতে ইচ্ছে করে না।

দাদামশাই বললেন, আমারও তাই মনে হয়েছে। নামটা যেন সুকুমার রায়ের বকচ্ছপ হয়ে আছে।

কোর্টে গিয়ে এভিডেভিড্ করে ম্যাকডোনাল্ড থেকে মজুমদার হলেন। সময়টা সম্ভবত চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ সাল।

যুদ্ধের তুরন্ত ঢেউ আছড়ে পড়ছে দেশের মাটিতে। জিনিস-পত্রের দর উঠছে চড়চড় করে, শহরে-নগরে ব্ল্যাকআউটের হিড়িক চলেছে, সাইরেন বেজে উঠছে যখন-তখন, পথের এখানে-সেখানে বাফেলো ওয়াল, মিলিটারি ট্রাকের মিছিল চলেছে পথ জুড়ে, পাড়ার বেকার লাইন দিয়ে সি. আর. পিতে নাম লেখাচ্ছে। টাকা উড়ছে শহরের আকাশে-ভার বাতাসে, সংসারের লোভ পথে ঠেলে দিচ্ছে বাড়ির মেয়েদের।

আশ্চর্য

সে-সময় কোন-কোন স্বেচ্ছাব্রতী সংস্থা ইংরেজ ও আে সেনাদের আহ্বান করে মেলামেশার সুযোগ করে দিচ্ছিল আমার এই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যারা ফ্রণ্টে চলেছে—কে

তারা ফিরবে কিনা। যাবার আগে তারা অন্তত জেনে যাক, দেশে-দেশে স্নেহ-ভালোবাসার আঁচল পেতে আছে তাদের মা-বোনেরা।

এই রকম একটা অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্যে মায়ের কাছে তাগিদ এসেছিল।

একটানা অনেকক্ষণ কথা বলে মণিকা কাঞ্জিলাল জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন লাগছে চৌধুরীসাহেব ?

ভেরি ইনটারেস্টিং।

মুষলধারায় বিষ্টির সঙ্গে বাতাসের ঝাপটা এসে লাগছে পাহাড়ের গায়।

তারপর ?

তারপর। শব্দটা উচ্চারণ করে মণিকা কাঞ্জিলাল অন্ধকারে চুপ করে রইলেন তারপর ধরা গলায় বললেন, এমনি একটা অনুষ্ঠানে হাজির থেকে মাকে চরম মূল্য দিতে হল এক আমেরিকান সৈন্যের ইচ্ছের আগুনে পুড়ে।

অন্ধকারে মণিকা কাঞ্জিলালের গলা কোথায় যেন তলিয়ে গেল। বাইরে বুঝি বিষ্টির শেষ নেই। ঝাঁকে-ঝাঁকে বিষ্টি দমকা হাওয়ার সওয়ার হয়ে আসছে। নিবিড় অন্ধকারের নিষ্ঠুর বিদ্রূপ বিজলির আলো হয়ে ঠিকরে যাচ্ছে বনভূমির ওপর।

চুপ করে গেলেন যে মিসেস কাঞ্জিলাল ?

ভাবছি।

কি এত ভাবছেন ?

মায়ের কথা ভাবছি। আর ভাবছি, এমন কপাল আমার কাঁটা
য়ের পেটে এসেছিলাম।
ম্যাব
?
মিশনে
অসুবিধে াল ভয়ঙ্কর গর্জন ঝড়ের আওয়াজ ছাপিয়ে ভেসে উঠল।
কলকাতায় কে সেই আওয়াজ বাজ পড়ার মতো আছড়ে পড়ল

নিচে। দুরন্ত সেই গর্জনের আলোড়ন ফসফরাসের মতো জ্বলে উঠে বাতাসের স্তরে-স্তরে ত্রাস ছড়িয়ে দিল।

মণিকা কাঞ্জিলালের গল্পের তন্দ্রা মুহূর্তে ছিঁড়ে-খুঁড়ে গেল; হাতের হাতিয়ার সামলে সজাগ হয়ে বসলেন প্রদোষ চৌধুরী।

বাঘিনীর একটানা ডাক কামানের গোলার মতো ঝড়ের বাতাসে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভেঙে-চুরে ছড়িয়ে যেতে লাগল।

প্রদোষ চৌধুরী নতুন করে পাইপ ধরিয়ে বললেন, ভয় করছে নাকি মিসেস কাঞ্জিলাল?

করছে না বললে মিথ্যে বলা হবে নাকি?

আমার হাতে হাতিয়ার থাকলে আপনি নিরাপদ জানবেন পাইপের আগুনে দেখা গেল, প্রদোষ চৌধুরীর মুখের পরিলিখন গূঢ় এক ভাবনায় ডুবে আছে।

মণিকা কাঞ্জিলাল নিজের জায়গা ছেড়ে প্রদোষ চৌধুরীর পাশে সরে এলেন, বড্ড ভয় করছে। এমন অভিজ্ঞতা আগে তো কখনো হয়নি।

বাঘিনীটা ফিরে এসেছে। নিজের মনে স্বগতোক্তি করেন প্রদোষ চৌধুরী।

চৌধুরীসাহেব আপনার বন্ধু নিরাপদে তাঁবুতে ফিরে যেতে পেরেছে?

সিওর্-সিওর্। পাইপ কামড়ে উত্তর দিলেন প্রদোষ চৌধুরী।

কখন যে রাত পোহাবে! ফিসফিসিয়ে কথা বলেন মণিকা কাঞ্জিলাল।

সেই আশায়ই তো প্রহর গুনছি! কখন বিষ্টি থামবে। রোদ উঠবে। আমরা তাঁবুতে ফিরে যাব। গরম চা নিয়ে বয়-বেয়ারা ছুটে আসবে!

উঃ, ভাবতে কি যে ভালো লাগছে! ছটফট করে ওঠেন মণিকা কাঞ্জিলাল।

আপনি একটু ঘুমোতে চেষ্টা করুন। আমি পাহারায় রইলাম।

একলা জেগে থাকবেন!

আপাতত সেটাই আমার একমাত্র কাজ।

বসে-বসে কি ঘুম হবে! এক টুকরো পাথরের ওপর কনুই রাখেন মণিকা কাঞ্জিলাল।

চেষ্টা করে দেখুন।

ইতিমধ্যে ঝড়ের বেগ কমে এসেছে। বিষ্টিও বুঝি ধরে আসছে।

আবার বাঘিনীর ডাক শোনা গেল। দুর্জয় এক প্রতিহিংসার আগুন হয়ে দাউ-দাউ করে জ্বলছে। অন্ধকারে রহস্যময় আতঙ্ক হয়ে বাঘিনী বোধহয় সঙ্গীর খোঁজে ঘুরে মরছে।

ভয়ঙ্কর এক রাত্রি মালগাড়ির মতো ধিকধিক করে প্রহরের প্রান্তর পার হয়ে চলেছে।

প্রদোষ চৌধুরী হাতের রেডিয়াম ডায়ালে চোখ ফেললেন, রাত দশটার স্টেশন সবে পার হয়েছে।

পাশ ফিরে একবার মণিকা কাঞ্জিলালের দিকে তাকালেন। দু'হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে আছেন মহিলা। ঘুমোচ্ছেন কিনা কে জানে। গায়ে-মাখা ফিকে সুগন্ধি বাতাসে উড়ছে এক-একবার। তার অনুভবে, এই পুষ্প-লাবণ্যের মায়া বিগতকালের কোন বসন্ত-স্মৃতিকে বারবার ফিরিয়ে আনতে চাইছিল। সে-কাল সে-সৌরভ হঠাৎ জীবন্ত হয়ে হানা দিয়ে যাচ্ছে।

দূরে কোথায়, পাহাড়ের কোন ধার থেকে যেন সম্বরের ডাক ভেসে এল। ঘন-ঘন ডেকে জঙ্গলের চৌকিদারি বজায় রাখছে। সজাগ করে দিচ্ছে বনচরদের, হুঁশিয়ার হো দুশমন!

বাঘিনী তাহলে পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে নেমেছে। মনে-মনে ভাবলেন প্রদোষ চৌধুরী। জঙ্গলের পাহারাদার তার কাছে সেই রকম খবরই পৌঁছে দিচ্ছে।

বন্দুকটা হাতের কাছে রেখে বিনিদ্র প্রতীক্ষায় বসে রইলেন প্রদোষ চৌধুরী, কখন ভোর হবে!

সারা রাত ঘুমোননি! চোখ মেলে প্রথম কথা বললেন মণিকা কাঞ্জিলাল। এলোমেলো চুলের আড়ালে চোখ-দুটো ফোলা-ফোলা।

হাসলেন প্রদোষ চৌধুরী। পরিমিত মধুর হাসি, আপনি তো ঘুমিয়েছিলেন।

মণিকা কাঞ্জিলাল চুলের গোছা মুখের ওপর থেকে সরালেন, ভয়ের হাত থেকে পালাতে চেয়েছিলাম। হঠাৎ বাইরের দিকে চোখ ফেলে বললেন, আরে, পৃথিবীটা হারিয়ে গেল নাকি!

সেইজন্যেই তো অপেক্ষা করছি—কুয়াসা না-কাটলে বেরুতে পারছি না!

আর ভাল লাগছে না চৌধুরীসাহেব। এবার যে-করে হোক আমাকে তাঁবুতে ফিরিয়ে নিয়ে চলুন।

ধৈর্য ধরতে হবে ম্যাডাম। এই কুয়াসায় বেরুলে সারা জীবন আপনাকে আমার সঙ্গে ঘুরে মরতে হবে!

খিলখিল করে হেসে ওঠেন মণিকা কাঞ্জিলাল, তা মন্দ কি!

আপত্তি নেই তবে! মণিকা কাঞ্জিলালের দিকে তাকিয়ে আড়-চোখে হাসেন প্রদোষ চৌধুরী।

মোটেই না চৌধুরীসাহেব! আমার ভয় হচ্ছে তখন আবার আমায় ফেলে পালিয়ে যাবার ফিকির না খোঁজেন!

গলা ছেড়ে হেসে ওঠেন প্রদোষ চৌধুরী, চমৎকার বলেছেন মিসেস কাঞ্জিলাল!

কাল রাত্তিরেই বিষ্টি থেমে গেছে। সকাল থেকে গাঢ় কুয়াসা জঙ্গলের টুঁটি কামড়ে তার ওপর চেপে বসে আছে। সূর্য আজ কিনা কে জানে!

কতোক্ষণ পরে জঙ্গল আর পাহাড়ের গা-থেকে লেপটে থাকা অন্ধকার আলগা হয়ে এলিয়ে পড়ল। ঝলমল করে উঠল রোদ।

উঠুন। মণিকা কাঞ্জিলালকে তাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন প্রদোষ চৌধুরী।

গুহার বাইরে বেরিয়ে এলেন দুজনে।

বিষ্টিতে স্নান করে বনের সবুজে আশ্চর্য এক রঙ ফিরেছে। পাতার সবুজে-সোনায় ঝাড় লণ্ঠনের আলো ঠিকরে যাচ্ছে।

নামুন। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতে সুরু করলেন প্রদোষ চৌধুরী

আপনার বন্ধু লোকজন নিয়ে আমাদের খোঁজে আসতে পারে।

কোন পথ দিয়ে আসবে বুঝতে পারছিনে। দেরি করলে অনেক বেলা হয়ে যাবে। আমরা এগোতে থাকি পথে হয়তো দেখা হয়ে যাবে।

দুজনে ঝোপ-ঝাড় পেরিয়ে এগোতে থাকেন।

অনেকখানি নেমে মণিকা কাঞ্জিলাল থেমে গেলেন।

কি হল থামলেন যে?

এর থেকে তাড়াতাড়ি যেতে পারছি না। পা পিছলে যাবে যে!

তা'হলে আমার হাত ধরুন। হাত বাড়িয়ে দিলেন প্রদোষ চৌধুরী।

ঝুঁকে প্রদোষ চৌধুরীর হাতটা চেপে ধরে মণিকা কাঞ্জিলাল। চলুন—এবার পড়লে আপনাকে সঙ্গে নিতে পারব! ঠোঁটে তার হাসি চিকচিক করে।

জঙ্গলের সীমানায় পৌঁছে সতর্ক হয়ে গেলেন প্রদোষ চৌধুরী।

মণিকা কাঞ্জিলালকে পাশে রেখে বন্দুক রেডি করে এগোতে থাকেন।

রোদ উঠেছে। পাতার ডগায় শিশিরের ফোঁটা হীরের মতো জ্বলছে। পাখিদের বিচিত্র কথা-কাকলিতে বনভূমি ভরে উঠেছে।

ছায়া-ঢালা গাছপালার সবুজ সমুদ্দুরের মাঝখান দিয়ে পায়ে-

চলা পথ নেমে গেছে। জলে-ভেজা বনের গন্ধ গলা জড়িয়ে ধরেছে পথের।

চৌধুরীসাহেব।

পিছনে না-তাকিয়ে প্রদোষ চৌধুরী উত্তর দিলেন, বলুন—

কিসের একটা মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছি চৌধুরী সাহেব?

সম্ভবত অর্কিডের। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদোষ চৌধুরীর। একটু পরে বললেন, আর একটিও কথা নয়। আমি অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছি। এখানে অসতর্ক হওয়া মানেই রিস্‌ক্।

দুজনেই নিঃশব্দে এগিয়ে চলেন কাল রাতের ঝড়েভাঙা গাছের ডাল-পালা পাতা-পত্তর মাড়িয়ে।

চারদিকে তন্ন তন্ন করে দেখে প্রদোষ চৌধুরী সামনের দিকে গেলেন।

পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে তিরি। কাল রাতের বিষ্টিতে উপচে-পড়া জলের বিপর্যস্ত প্রবাহ—টুকরো পাথরে ধাক্কা খেয়ে সাদা ফেনার রাশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নিচে নামছে। ভারি আশ্চর্য একটা গানের সুর একটানা ঝমঝম করে বেজে চলেছে। বুঝি ওঁরাও মেয়ের দল মল পায়ে হেঁটে দূর কোন গাঁয়ে চলেছে!

চৌধুরীসাহেব।

উঁ-হুঁ-উঁ! কথা বলতে নিষেধ করার সংকেত দিলেন প্রদোষ চৌধুরী সেফটি ক্যাচ্ ঠেলে দিয়ে ট্রিগারে আঙুল রেখে পথের প্রতি মিটার পরখ করে এগোতে লাগলেন।

আরো অনেকখানি পথ এগিয়ে থামলেন প্রদোষ চৌধুরী। তারপর মণিকা কাঞ্জিলালের দিকে চেয়ে হাসলেন, সামনের জঙ্গল এলাকা পার হতে পারলেই তাঁবুর সামনে পৌঁছে যাবো।

আপনাকে দেখে মনে হয় জঙ্গলের যতো বাঘ সব বুঝি পথের দুপাশে এসে জড়ো হয়েছে।

চারদিকে একবার তাকিয়ে প্রদোষ চৌধুরী মণিকা কাঞ্জিলালের

একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, আমার কি রকম মনে হয় বাঘিনীটা আমাদের ওপর নজর রেখেছে। যে কোন সময় ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে—

খিলখিল করে হেসে ওঠেন মণিকা কাঞ্জিলাল, আপনি ব্যাচিলর তাই বোধহয় ঝাঁপিয়ে পড়েনি এখনও!

প্রগলভতার উত্তর দিলেন না প্রদোষ চৌধুরী মৃদুকণ্ঠে বললেন, চলুন—এই পথটুকু পেরিয়ে যাই—।

জঙ্গলটা পেরিয়ে আবার তিরি চোখে পড়ল।

এখানে-সেখানে কয়েকটা আমলকীগাছ তারপরই খানিকটা ফাঁকা জায়গা। ওপারেই তাঁবুর জনপদ।

এসে গেছি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন প্রদোষ চৌধুরী।

মিহি রেশমের মতো চকচকে একটা হাসি ছড়িয়ে গেল মণিকা কাঞ্জিলালের মুখে, আঃ বাঁচলাম—কতোক্ষণ ধরে ভাবছি চায়ের পেয়ালা হাতে পাব!

কোমরে গোঁজা পাইপটা হাতে নিয়ে পাশের একটা গাছে ঠুকে পোড়া তামাকটা ফেলবেন বলে ঝাড়তে গেলেন প্রদোষ চৌধুরী আর পাইপটা হাত ফসকে বিশ-তিরিশ গজ দূরে একটা ঝোপের উপর গিয়ে পড়ল।

আর মুহূর্তের মধ্যে ঝোপের আড়াল থেকে বাঘিনীটা স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে পলকের মধ্যে গা ঢাকা দিল।

এমন একটা ব্যাপার কল্পনাও করতে পারেন নি প্রদোষ চৌধুরী।

পাথরের মতো অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। একটা অশরীরী হাত বরফের শীতলতা দিয়ে তাঁকে ছুঁয়ে গেল।

পাইপটা আমাদের বাঁচিয়ে দিল। ধরা গলায় কথা বললেন প্রদোষ চৌধুরী অনেকক্ষণ পরে।

ওই ঝোপটার পাশ দিয়েই আমাদের যেতে হতো। মণিকা

কাম্পিলালের বুকটা ব্যাধের হাতে ধরা-পড়া পাখির মতো থরথর করে কাঁপে।

মিসেস কাম্পিলাল। থেমে গেলেন প্রদোষ চৌধুরী।

বলুন।

সামান্য অসতর্ক হলে জঙ্গলে অসামান্য মূল্য দিতে হয়। আর তাই আমরা দিতে যাচ্ছিলাম। লাফিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি হয়েছিল বাঘিনীটা।

আমি তো কিছু বুঝতেই পারিনি—আমার মনে হল শুধু এক চিলতে হলুদ রোদ ছিটকে গিয়ে পড়ল গাছপালার আড়ালে—

আর দেরি নয়। আপনাকে মালিকের হাতে তুলে দিতে পারলে তবে নিশ্চিন্দি! প্রদোষ চৌধুরী আবার হাসলেন।

সামনের ঝুঁকেপড়া কেঁদ গাছের ডালে একটা পাখি ডাকছে: ঘু—রু—রু—রু—রু—রু—রু!

সারাটা দিন ঘুমিয়ে কাটালেন প্রদোষ চৌধুরী। গত দিনের ক্লান্তি তাকে একটানা কয়েক ঘণ্টা ঘুমের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছিল। যখন ঘুম ভেঙে চোখ মেললেন তখন সূর্য পাহাড়ের প্রায় আড়ালে। ঝলমলে একটা আলো পাহাড়ের গা বেয়ে নিচের জঙ্গলের উপর গড়িয়ে যাচ্ছে।

শুয়ে রইলেন প্রদোষ চৌধুরী। সুইস কটেজের জানালা দিয়ে নীল আকাশকে চোখে রেখে অপলক হয়ে রইলেন।

কাল রাত্রে বিস্মরণীয় নয় এমন একটা অভিজ্ঞতা তার ঘটে গেছে। সারা জীবন সময় নিঙড়ে সোনার খড়কুটো কুড়িয়ে ফিরলেন। অথচ কোথায় যেন একটা ফাঁক—একটু ফাঁকি রয়ে গেছে। এতদিন বোঝা যায় নি আজ সেই ফাঁকটা প্রকাণ্ড গহ্বর হয়ে তাকে গিলে ফেলতে চাইছে। যা সঞ্চয় হয়েছে সেই নিরেট সোনা-রুপোর প্রাণহীন পিণ্ডের চেয়ে আর-কিছু অন্য-কিছু তাকে টানছে যাতে জীবনের রঙ আছে। স্পর্শ আছে। আনন্দ-বেদনা আছে।

মনে মনে ভাবলেন প্রদোষ চৌধুরী, এই সব অনুভব যা একটা-দুটো করে ফুটে উঠছে মনের প্রান্তরে, ফুলের মতো। নক্ষত্রের মতো। এরা কারা?

এবার আকাশ থেকে চোখ ফেরালেন প্রদোষ চৌধুরী।

কী-একটা বিষণ্ণ অনুভব মনের মানচিত্র থেকে ছায়াচ্ছন্ন পাখির মতো অনাবিষ্কৃত মহাদেশের উপকূলের-দিকে উড়ে যাচ্ছে।

কাল কিংবা পরশু এই তাঁবুর বসতি ভেঙে যাবে।

মানুষ-জন ফিরে যাবে।

বনবাসের এই কটি দিনের ওপর গাঢ় নির্জনতা হেমন্তের ঝরা পাতার মতো ঝরে পড়বে।

সংখ্যায় তারা একটা-দুটো নয়, অসংখ্য-অযুত।

প্রদোষ চৌধুরীও ফিরে যাবেন কোডার্মা। কাজে গা-ভাসিয়ে ডুবে যেতে হবে তাকে। তবু সময়ের প্রান্তর দিয়ে হেঁটে যেতে কখনো কি হাজারিবাগের এই সব দিন-রাত্রির কথা একবারও কি মনে পড়বে না। বসন্তের কোন ঘুম-ভাঙা নিশুত রাতে ঢল-নামা জোছনায় মাঠের দিকে তাকিয়ে বুকের মধ্যে হারানো কোন ব্যথা ফুলের আতর হয়ে ছড়িয়ে যাবে না!

তাঁবুর দরজায় কার পায়ের শব্দ শোনা গেল।

কে। পাশ ফিরে উঠে বসলেন প্রদোষ চৌধুরী।

তাঁবুর পর্দা সরিয়ে ভেতরে এলেন বিনয় কাঞ্জিলাল, ঘুমোচ্ছ নাকি হে চৌধুরী।

মাথা নাড়েন প্রদোষ চৌধুরী, ন্-না-না। এসো—এসো—

হেমন্তের দুপুরে ঘুমোন স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয়। হো-হো করে হেসে ওঠেন বিনয় কাঞ্জিলাল।

ঘুমোইনি বললে মিথ্যে বলা হবে। তবে বিকেলের আগেই উঠে পড়েছি। পাইপ আর পাউচটা হাতে তুলে প্রদোষ চৌধুরী তাড়া

দিলেন, আঃ কাঞ্জিলাল দাঁড়িয়ে রইলে যে—বসছ না কেন? বোস—হাত-পা ছড়িয়ে একটু আরাম করছিলাম।

ক্যাম্প চেয়ারে বসলেন বিনয় কাঞ্জিলাল।

পাইপে তামাক ভরে নিতে গিয়ে প্রদোষ চৌধুরী হাসলেন, ভাই বিনয় রাগ ক'রো না কিন্তু—

রাগ করবো কেন। অবাক হলেন বিনয় কাঞ্জিলাল।

ভাবছি, তোমাকে কি করে আপ্যায়ন করি। আমার তো অন্দরমহল নেই। গৃহিণীও নেই।

ঠাট্টা রাখো চৌধুরী, এদিকে খবর শুনেছ তো?

খবর! বিনয় কাঞ্জিলালের মুখের দিকে তাকালেন প্রদোষ চৌধুরী, কিসের খবর?

কালকের ঝড়ে অনেক গাছপালা ভেঙে পড়েছে।

ঝড় এলে তাই তো হয়। পাইপে টান দিলেন প্রদোষ চৌধুরী।

মুশকিল হয়েছে, কাঠের লোভে এখানকার দেহাতি মানুষজন দল বেঁধে জঙ্গলে ঢুকেছিল আর তাদের একজনকে বাঘিনী তুলে নিয়ে গেছে।

বলো কি! পাইপ দাঁতে কামড়ে প্রদোষ চৌধুরী তাঁবুর জানালার দিকে তাকালেন, সকালের শিকার ফসকে যাবার পর বেপরোয়া জানোয়ারটা অন্য জায়গায় হামলা করে ফয়দা তুলে নিয়ে গেছে।

এদিকে মুশকিল হয়েছে, লোকজন আর থাকতে চাইছে না। বড্ড ভয় পেয়ে গেছে তারা।

তাদের দোষ দেওয়া যায় না। ভাবনায় ডুবে থেকে উত্তর দিলেন প্রদোষ চৌধুরী।

কিন্তু আমি কি করি বলো তো চৌধুরী।

প্রদোষ চৌধুরী ভুরু কুঁচকে বিনয় কাঞ্জিলালের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

চলে যাওয়া মানে বুঝতে পারছো চৌধুরী?

মাথা নাড়েন প্রদোষ চৌধুরী, দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে ফিরতে হবে।

আমার পক্ষে দেবার মতো তেমন কৈফিয়তও রইল না। অথচ তুমি জানো, চেষ্টার কোন ত্রুটি আমরা রাখিনি।

তার চেয়ে বড়ো কথা—। প্রদোষ চৌধুরী হিসেব করে কথা বলেন, এখানকার মানুষদের আমরা কি অবস্থায় ফেলে যাব।

তাই ভাবছি। সায় দিলেন বিনয় কাঞ্জিলাল।

বন তো এখানকার মানুষদের আত্মার সঙ্গে মিশে আছে। কাউকে আলাদা করা যায় না। কতোকাল ধরে দুপক্ষে দেওয়া-নেওয়ার পালা চলেছে। বাঘের ভয়ে বন থেকে সরে থাকতে গেলে প্রাণে বাঁচবে না।

দুজনে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। কারো মুখে কথার জোগান নেই।

নীরবতা ভাঙলেন বিনয় কাঞ্জিলাল, আরো দু'-একদিন থেকে যাওয়া যেত। পাহারাদার কেউ থাকতে চাইছে না।

বাঘিনীটা যে-রকম বেপরোয়া স্বভাবের তাতে ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। ওদেরও বৌ-ছেলে মেয়ে আছে। বে-ঘোরে মরলে তাদের কে দেখবে।

তা'হলে কি করা যায় চৌধুরী? কি-যেন-একটা প্রত্যাশা বিনয় কাঞ্জিলালের চোখে।

মাথা নিচু করে পাইপ টেনে যেতে লাগলেন প্রদোষ চৌধুরী।

কিছু বলো?

ভাবছি।

বিনয় কাঞ্জিলাল প্রদোষ চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন।

হেমন্তের দিন শেষ হয়ে আসছে। অন্ধকারের ছায়া লেগেছে আলোর গায়।

এক কাজ করা যাক বিনয়।

বলো!

তুমি বরং তোমার লোকজন নিয়ে ফেরবার গোছ-গাছ সারা করে রাখো। আমি বরং আরেকবার বেরিয়ে দেখি—

তুমি একলা বেরুবে।

তাই ভাবছি। কিছু যদি করা যায় তবে দুপুরের মধ্যেই হবে। আমি ফিরলেই বেরিয়ে পড়া যাবে। রাতটা আর জঙ্গলে কাটাতে হবে না। পাইপে টান দিয়ে প্রদোষ চৌধুরী বলেন, তোমার কি মনে হয়?

কথাটা মন্দ বলো নি তবে—

মুখ ফেরালেন প্রদোষ চৌধুরী।

তুমি একলা ঝুঁকি নিতে যাবে এই ব্যাপারটা আমার মন মেনে নিতে পারছে না। মাথা নাড়েন বিনয় কাঞ্জিলাল।

বিনয়। সোজা হয়ে বসলেন প্রদোষ চৌধুরী, এত বড়ো একটা দুর্দান্ত জানোয়ারকে মারতে যাবার ঝুঁকি আছে সত্যি। সেই ঝুকিটা ভাগ হয়ে গেলে সতর্কতাও ভাগ হয়ে যাবে। বনের মধ্যে তোমার উপস্থিতি হয়তো আমাকে নিশ্চিন্তের ঘেরা টোপের দিকে একটু ঠেলে দিতে পারে। আর সে-রকম ভাবনা মনে থাকলে সর্বনাশা অসতর্কতা আমাকে বারবার ছুঁয়ে যেতে পারে। ফল কি হবে তা তোমাকে বোঝাবার দরকার নেই।

তাঁবুর ভেতরটা অন্ধকার হয়ে এসেছে। বিনয় কাঞ্জিলালের চোখে-মুখে কে যেন কালো ওয়াটার কালার টেনে দিচ্ছে।

বনের মধ্যে আমি একলা থাকলে নিরাপত্তা আলগা করে দেবার কথা কখনো ভাবতে পারব না। কোন ঝুকি নেবার আগে নিরাপত্তার শেষ কথাটাও ভেবে নেব। তাই আমার মনে হয় আমার একলা যাওয়াই ভালো।

সেই ভালো।

এবার সহজ হয়ে নড়ে-চড়ে বসে প্রদোষ চৌধুরী পরিহাসের স্বরে বললেন, কারো জন্যে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ান এ বয়েসে তোমার সাজে

না হে কাঞ্জিলাল। তুমি তো আর আমার মতো বোহেমিয়ান নও—তোমার ঘর আছে। ঘরণীও আছে। হো-হো হেসে ওঠেন প্রদোষ চৌধুরী।

সিরিয়াস ব্যাপারে ঠাট্টা করা তোমার চিরকেলে অভ্যেস। উঠে পড়েন বিনয় কাঞ্জিলাল, ওঃ-হো, তোমার সঙ্গে কথা বলতে দেরি হয়ে গেল—চলো, মুমু চা নিয়ে বসে আছে—

তুমি এগোও আমি যাচ্ছি।

তাঁবুর দরজার কাছে গিয়ে বিনয় কাঞ্জিলাল আবার ফিরলেন, তোমার ইচ্ছে না-থাকলে এখানেই চা পাঠিয়ে দিতে বলি। মুমু অবিশ্যি তোমায় নিয়ে যেতে বলেছিল। ঠিক আছে—চলি চৌধুরী।

সূর্য ডুবে গেছে।

ছায়ার গায় হেলান দিয়ে রামগড় পাহাড় নিঃসঙ্গ মানুষের মতো দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে রাতের বান্ধবী সন্ধ্যাতারা মাথার ওপর উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।

জোয়ারের জলের মতো নিবিড় অন্ধকার ঝাপিয়ে পড়ছে পাহাড়ের গায়। অরণ্যের গায়।

তাঁবুর অন্ধকারে একলা বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন প্রদোষ চৌধুরী। তার চোখের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বন-পাহাড় মুছে যাচ্ছে।

আলো জ্বালতে গিয়ে ফিরে এলেন। অন্ধকারই ভালো। মনে হল, অন্ধকারের কফিনে নিথর হয়ে থাকাই ভালো। বনবাসের এ ক'দিনে ভারি আশ্চর্য একটা অনুভূতি কুড়িয়ে পেয়েছেন। নিভৃত সময়ে তাই হাতে করে নেড়ে-চেড়ে দেখছেন জিনিষটা কী।

ঝিনুক যেমন যন্ত্রণার প্রহর পেরিয়ে আত্মায় জন্ম দেয় মুক্তো—প্রদোষ চৌধুরীর আত্মায় যা জাত হল তার নাম কী প্রেম!

সূর্যের রঙ যেমন ফুলে ধরা দেয় ভালোবাসার রঙও তেমনি হৃদয়ে ধরা পড়ে। সূর্য কোন সুদূর শূন্যে—ফুল কোন বসুন্ধরা প্রান্তে মাঝখানে

দুস্তর ব্যবধান তবু একজনের প্রাণের রঙ অন্যজনকে রঙীন করে তোলে কি করে! আশ্চর্য! আশ্চর্য!

কতোক্ষণ পরে পর্দার গায় কার হাতের কাঁকন বেজে উঠল।

কে!

একি চৌধুরী সাহেব আপনার ঘরে আলো জ্বেলে দিয়ে যায় নি! মণিকা কাঞ্জিলালের স্নিগ্ধ কণ্ঠ কথা বলে উঠল।

আমি জ্বালাতে চাইনি।

কেন?

কি-জানি-কেন অন্ধকারই আমার ভালো লাগছে। উঠে বসলেন প্রদোষ চৌধুরী।

চা এনেছি। চায়ের কাপ এগিয়ে দিলেন মণিকা কাঞ্জিলাল।

হাত বাড়িয়ে দিলেন প্রদোষ চৌধুরী, দিন—এরই প্রত্যাশায় ছিলাম। চায়ে চুমুক দিয়ে প্রদোষ চৌধুরী উচ্চারণ করলেন, আঃ—

চৌধুরী সাহেব।

মণিকা কাঞ্জিলালের গলার স্বরে চমকে উঠলেন প্রদোষ চৌধুরী, বলুন—

কাল নাকি আবার জঙ্গলে বেরুচ্ছেন?

ভাবছি। অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিলেন প্রদোষ চৌধুরী, পারব কিনা এখনো ঠিক জানি না।

আপনার যাওয়া হবে না।

কেন! অবাক হলেন প্রদোষ চৌধুরী, কেন যাওয়া হবে না?

এমনি। আলতো গলায় জবাব দিলেন মণিকা কাঞ্জিলাল।

এমনি। উচ্চারণ করেন প্রদোষ চৌধুরী, আশ্চর্য, সে আবার কি রকম কথা!

সব কথার মানে না-হয় নাই বা বুঝলেন চৌধুরী সাহেব।

তা'হলে, অসহায় মানুষজনকে মানুষখাকিটার মুখের সামনে ফেলে যাব নাকি!

আপনার এত দায় কিসের ?

প্রদোষ চৌধুরী হাসলেন, ডাক্তারের কাছে ওষুধ থাকলে রোগীর সংকটে তা ব্যবহার করতেই হয়, না-হলে বিবেকের কাছে তাকে জবাব দিহি করতে হবে মিসেস কাঞ্জিলাল।

উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলেন মণিকা কাঞ্জিলাল।

হাতের কাছের লণ্ঠনটা জ্বেলে দিলেন প্রদোষ চৌধুরী। রিনরিনে একটা আলো ছড়িয়ে গেল দুজনের মুখে।

স্মিত মুখে মণিকা কাঞ্জিলালের দিকে তাকিয়ে প্রদোষ চৌধুরী জিজ্ঞাসা করলেন, কেন যে আপনি এমন করে বাধা হয়ে দাঁড়ালেন!

যদি বলি আমার ইচ্ছে।

কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলেন প্রদোষ চৌধুরী। তারপর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, এ কথার কোন উত্তর নেই।

লণ্ঠনের মৃদু আলোয় মণিকা কাঞ্জিলালের মুখের দিকে বিহ্বল প্রদোষ চৌধুরী অপলক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। সেই অনিন্দ্য মুখে কিছু-একটা খুঁজে পাবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে ওঠেন। তার অস্থির বিহ্বলতা কেটে যাবার পর বলেন, আপনার এমন ইচ্ছের কারণ জিজ্ঞাসা করব এমন ধৃষ্টতা আমার নেই। তবু কৌতূহল দুরন্ত হয়ে উঠেছে—অনেকটা লাগাম-ছেঁড়া ঘোড়ার মতো—

চৌধুরী সাহেব।

বলুন।

চুপ করে রইলেন মণিকা কাঞ্জিলাল।

মিসেস কাঞ্জিলাল আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে—বসবেন না ?

না। তাঁবুর কাপড়ের গায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মণিকা কাঞ্জিলাল, চৌধুরী সাহেব মেয়েদের মনের কথা যে গভীরে থাকে সেখানে চন্দ্র-সূর্যের আলোও বাধা পায়। কি লাভ আপনার জেনে, যখন জঙ্গলে ঢুকবেন একজনের উদ্বেগের সীমা থাকবে না, কেন যে তার এই উদ্বেগ সে নিজেও জানে না। অথচ যতক্ষণ না তাঁবুর নিরাপদ সীমার মধ্যে

ফিরছেন তাকে ছটফট করে বেড়াতে হবে। সেই একজন আমাকে ঘরে থাকতে দিল না। চৌধুরী সাহেব, আপনাকে বিপন্ন করে তাকে আর দুঃখ দেবেন না!

এতক্ষণ মাথা নিচু করে বসেছিলেন প্রদোষ চৌধুরী মুখ তুলে তাকাতে দেখেন মণিকা কাঞ্জিলাল চলে গেছেন।

খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন প্রদোষ চৌধুরী তারপর ইচ্ছে করে লণ্ঠনের আলোটা নিভিয়ে দিলেন।

কি করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। নিজেকে কেমন অসহায় আর অস্থির বলে মনে হল। মনে হল, এই নিবিড় অন্ধকারে একটুখানি ভালোবাসা যদি অনেকক্ষণ বিষ্টির মতো রিমঝিম শব্দে তার ওপর ঝরে-ঝরে পড়ত। হাত বাড়িয়ে টু-ইন্-ওয়ানের সুইচটা টিপে দিলেন। তার নিঃসঙ্গ সময়ের সঙ্গী একটু কথা বলুক কি গান করুক।

অন্ধকারে প্রদোষ চৌধুরী আশ্চর্য হয়ে শুনলেন:

যখন এসেছিলে অন্ধকারে
চাঁদ ওঠেনি সিন্ধুপারে!

দুপুরের পর তাঁবুর নিশানায় মুখ ফেরালেন প্রদোষ চৌধুরী।

সারাটা দিন আজ বাঘিনীর অভিসারে কেটে গেল। তিরির ধারা বেয়ে নিচের দিকে নেমেছিলেন। তার মনে হয়ে ছিল, পাহাড়ের নিচের দিকে জলের ধারে গাছপালার আড়ালে কোন ফাটলের গভীরে হয়তো বাঘিনীর দেখা পাবেন। হয়তো হেমন্তের রোদে পাথরে গা এলিয়ে সেই ডোরাকাটা হলুদ অভিসন্ধি অলস প্রহর কাটাবে। তার নীলচে হলুদ চোখ ছলোছলো ঘুমে আবিল হয়ে যাবে। আচমকা তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চারশ গ্রেনের জবরদস্ত বুলেট দিয়ে শয়তানির জারিজুরি খতম করে দেওয়া যাবে।

সেই হিসেবেই পাহাড়ের গা-বেয়ে নিচে নেমে এসেছিলেন। বাঘিনীর তাজা পায়ের ছাপ যে দু'-এক জায়গায় খুঁজে বার করতে

পারেন নি এমন নয়। পাথুরে এলাকায় পায়ের ছাপ সহজে ধরা যায় না তবু প্রদোষ চৌধুরীর কড়া নজর অস্পষ্ট সেই ছাপ ধরে অনেক দূর এগিয়ে ছিলেন। তিরির এপারে-ওপারে জল ভেঙে হেঁটে-চলে সমস্ত এলাকা তন্নতন্ন করে খুঁজে নিরাশ হয়ে ফিরতে হয়েছে। গিরিনদীর খাত-খানা-খন্দ আড়াল-আবডাল সবই তো খোঁজা হল। কোথায় কোন ফিকিরে বাঘিনী যেন হাওয়া হয়ে গেছে। হয়তো এ এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও হানাদারি করতে গেছে।

এ যাত্রায় ও বাঘিনী রেহাই পেয়ে গেল। প্রদোষ চৌধুরীর মনে হল, একবার বিটিং কি মাচা বেঁধে দেখলে হত। সেটা বোধ হয় এ যাত্রায় আর হল না। আজই শেষ দিন।

তাঁবু গুটিয়ে ফিরে যাবার পালা। হয়তো সবাই মাল-পত্র গুছিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছে। ফিরে যাবার পর এক পেয়ালা চায়ের বেশি সময় পাওয়া যাবে না। তারপরই রাঁচি-হাজারিবাগ রোড ধরে যাত্রা সুরু।

তারপর রাত্রি আসবে। অন্ধকার নামবে।

সমস্ত এলাকা জুড়ে বাঘিনী ত্রাসের মতো ত্রাসের রাজত্ব চালিয়ে যাবে। হামেশা যে-জঙ্গলে মানুষকে চলাফেরা করতে হয় সেখানে নৃশংস এক বিপদ সারাক্ষণ আতঙ্ক হয়ে থাকবে।

মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকালেন প্রদোষ চৌধুরী। বনের ওপর কোথাও শকুন উড়ছে কিনা পাত্তা করতে চাইলেন। দূরবীনের মতো চোখ দুটো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আকাশের আঙিনায় মাংসাশী সেই পাখিদের ঠিকানা পেলেন না। অনেক সময় এই সব স্ক্যাভেঞ্জার বার্ড দেখে বাঘের গতিবিধি আঁচ করা যায়। বাঘের লুকিয়ে-রাখা আধ খাওয়া লাশ এদের চোখ এড়াতে পারে না।

হতাশ হলেন প্রদোষ চৌধুরী। মাথার টুপিটা আরেকটু নামিয়ে দিয়ে এগোলেন। এবার রোদের দিকে মুখ করে হাঁটতে হবে।

পরশু দিনকার বিষ্টির পর বনের যেন রঙ ফিরেছে।

যদিও পাতা ঝরার কাল শুরু হয়ে গেছে তবু যেন সবুজের ঘাটতি

নেই। নিবিড় গভীর এক সবুজ সমুদ্দুর রামগড় পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে গেছে পালামৌ জেলার দিকে। সজীব সেই সবুজ লাবণ্য আলোর সঙ্গে মিলেমিশে মায়াবী এক নিলয় রচনা করে রেখেছে। নির্জনতায় কী-যেন-এক বেদনা সেখানে যাযাবর হয়ে ফিরছে!

ফেরবার পথে মণিকা কাঞ্জিলালের কথা মনের মধ্যে গুনগুনিয়ে উঠল।

কাল সন্ধ্যেবেলায় হঠাৎ যখন এসে হাজির হল, মুগ্ধ করার মতো কোন সাজ ছিল না। আচমকা এসে চমকে দিল প্রদোষ চৌধুরীকে? সেই মুহূর্তে মনে হল, সূর্যগন্ধা এই নারীর অর্বাচীন ঠোঁটে তার অলীক মৃত্যু-শয্যা পাতা আছে বুঝি!

মণিকা কাঞ্জিলাল তার কেউ নয়; বনবাসের পর্ব শেষ হয়ে গেলে দুজনে হয়তো আর দেখা হবে না। স্মৃতি থেকে বিস্মৃতির প্রবাহে ভেসে যাবে।

এলোমেলো একটু হাওয়া উঠে প্রদোষ চৌধুরীর চুলে বিলি কেটে দিল।

হাসলেন প্রদোষ চৌধুরী। কতোটুকু ক্ষতি মণিকা কাঞ্জিলালের তার নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটলে! সামান্য পরিচয়ে সাঁকো বেয়ে এসে এমনি করে ধরা দেওয়া বরং বলা যায় নিজের হৃদয়কে তুলে ধরা-সে তো এক বিস্ময়ের মহাদেশে পৌঁছে দেওয়া!

বেলা-শেষের সাঁজ-বেলাতে সেখান থেকে কী আর নিয়ে ফিরবেন! গর্হিত এক বেদনায় তার হৃদয় ছলছল করে।

মাথার ওপর পাখি ডাকে, টু-রু-রি—টু-রু-রি—টু-রু-রি—

চমকে ওঠেন প্রদোষ চৌধুরী।

এবার গভীর জঙ্গল এলাকা ছাড়িয়ে পথে নামতে হবে।

পীচ-ঢালা পথ গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়ে হাজারি শহরের দিকে চলে গেছে। পথ পেরিয়ে আবার জঙ্গল। সেই জঙ্গল এলাকা দিয়ে পাহাড়ের গা-বেয়ে উঠে তাঁবুর সামনে গিয়ে পড়বেন।

জোরে পা চালান প্রদোষ চৌধুরী। সঙ্কোচ হচ্ছে তার তাঁবুর দিকে এগোতে। মণিকা কাঞ্জিলালের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কী কৈফিয়ৎ দেবেন! তার একান্ত অনুরোধকে হেলা-ফেলা করে এসে কী লাভ হল!

সারাদিনের ক্লান্তি আর ব্যর্থতা পিঠে নিয়ে ফিরে যেতে হবে। তবু তার সঞ্চয় হয়ে রইল মণিকা কাঞ্জিলালের দুর্বলতার সোনালি ফুলগুলো!

পথে পড়ে প্রদোষ চৌধুরীর মনে হল, এক কাপ চায়ের তৃষ্ণা কখন যেন পেয়ে বসেছে।

রাস্তা ধরে একটু এগোলেই হিন্দুস্থানীদের চায়ের চটি পাওয়া যাবে। পথ-চলতি রাহী আর বাস-ট্রাকের ড্রাইভার সেখানে গাড়ি থামিয়ে চা খেয়ে যায়।

হাত-ঘড়ির দিকে তাকালেন প্রদোষ চৌধুরী।

মিনিট দশ-পনেরো হেঁটে সেখানে পৌঁছতে হবে। দেরি হয়ে যাবে হয়তো।

মনে মনে হিসেব করেন প্রদোষ চৌধুরী। চা-তো সেখানে তৈরি আছে। গেলেই পাওয়া যাবে। গরম চা খেতে যা সময় লাগবে তারপর আসা-যাওয়ার পথটা জোর কদমে হেঁটে সংক্ষেপ করে নিতে হবে। তাছাড়া চটির মানুষজনের কাছে বাঘিনীর খোঁজ-খবর পাওয়া যেতে পারে।

হেমন্তের দিনে ভাটার টান লেগেছে আলোয়। রামগড় পাহাড়ের গা-বেয়ে গলানো মোহরের মতো রোদ গড়িয়ে যাচ্ছে।

সূর্য পাহাড়ের আড়ালে হেললেই ঝপ করে দিন শেষ হয়ে যাবে।

আমলকীবনের ভিতর দিয়ে হেঁটে চললেন প্রদোষ চৌধুরী। এদিকটাতে পাহাড়ের আড়াল থাকাতে ছায়া নেমে গেছে এখুনি। রাস্তার দুদিকে তাকাতে-তাকাতে হঠাৎ চোখে পড়ল একটু দূরে জঙ্গলের ভেতর এক পাল হরিণ কোন দিকে চেয়ে আছে।

সতর্ক হয়ে গেলেন প্রদোষ চৌধুরী।

মানুষের পায়ের শব্দ পেয়ে হরিণেরা পলকে উদাও হয়ে গেল।

হাতের অস্ত্র বাগিয়ে পা চালালেন প্রদোষ চৌধুরী।

পথের বাঁক ঘুরতেই চটি চোখে পড়ল। দরজার ঝাঁপ ফেলা। লোকজনের কোন সাকিন নেই। প্রকাণ্ড উনুনে মুখ বন্ধ টিনের টবে জল সেদ্ধ হচ্ছে। রান্নার বাসন-কোশন ছড়ানো .

ঝাপ ফেলা চটির সামনে দাঁড়িয়ে চৌধুরী ব্যাপারটা অনুমান করতে চাইলেন। হাতের বন্দুকটা শক্ত মুঠোয় ধরে সতর্ক হয়ে মাটির ওপর ঝুকে তাকাতে বাঘিনীর পায়ের ছাপ খুঁজে গেলেন।

তা'হলে সেই ডোরাকাটা শয়তানীটা এখানে হানা দিয়ে গেছে। স্বগতোক্তি করলেন প্রদোষ চৌধুরী। চারদিকে তাকিয়ে কোথাও রক্তের দাগ খুঁজে গেলেন না। হয়তো তার হানাদারি বিফলে গেছে।

ঝাঁপের সামনে গিয়ে হাঁক দিলেন প্রদোষ চৌরী, আরে ভাই তুম সব কাঁহাঁ গিয়া—

সাড়া পাওয়া গেল না প্রথমে। পরপর কয়েকবার ঝাপে আঘাত করবার পর ফাঁক দিয়ে একটা মুখ দেখা গেল। চোখে-মুখে তার আতঙ্ক।

প্রদোষ চৌধুরী আশ্বাস দিলেন, দরওয়াজা খোল—কোই ডর্ নেই।

বন্দুক দেখে লোকটা বোধহয় সাহস ফিরে পেল। ঝাপ খুলে মাথাটা বের করে একবার চারদিক দেখে নিল। জানোয়ারটা সত্যি চলে গেছে কিনা। তারপর বেরিয়ে প্রদোষ চৌধুরীর সামনে এসে দাঁড়াল।

কী হয়েছিল ?

সাব বিশ সাল এখানে ব্যবসা চালাচ্ছি, কোন জানোয়ারীর চটিতে এসে এমন করে হামলা চালায়নি।

কি রকম ?

দুটো লরি এসেছিল। আমার বেটা তাদের চা দিয়ে ঝুটা বর্তন মাজতে বসেছিল। আমি উনুনে কয়লা দিচ্ছিলাম। সন্ধ্যেবেলায় অনেক লরি এসে থামবে তাদের জলদি খাবার-দাবার বানিয়ে দিতে হবে। হঠাৎ আমার চোখটা রাস্তার ওপার গিয়ে পড়তে হুঁশিয়ার

হয়ে গেলাম। লোকটা দম নিল। বোধহয় গলা শুকিয়ে গেছিল। পিছন ফিরে বলল, বেটা লোটা-ভর পানি লাও—। ঢকঢক করে জলটুকু নিঃশেষ করে আবার সুরু করল, ঝাঁড়োকে বিচসে শেরণী আওরৎ কী তরহ্ বৈঠী হ্যায়! লোকটা চারদিকে আরেকবার দেখে নিয়ে বলল, আমি বেটাকে টেনে নিয়ে ঝাঁপ টেনে দিতে-দিতে জানোয়ারটা বর্তনের উপর এসে আছড়ে পড়ল। বাপরে, রাগে গরগর করছিল। সাব, যদি দরজা ভেঙে ঢুকত আমাদের কিছু করবার ছিল না—বাপ-বেটার কাউকে টেনে নিয়ে যেত—

খুব বেঁচে গেছ।

লোকটা কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, হনুমানজীর কির্‌পা—

প্রদোষ চৌধুরীর বুঝতে অসুবিধে হল না। একটাকে টেনে নিয়ে যাবার জন্যে তৈরি হয়েই এসেছিল বাঘটা—হয়তো চটির দরজা ভেঙে হামলা করত। সম্ভবত তাকে আসতে দেখে সরে গেছে—হয়তো সুযোগের সন্ধানে ঘাপটি মেরে আছে।

প্রদোষ চৌধুরী জিজ্ঞাসা করলেন, কোনদিকে গেছে মনে হয়?

লোকটা একটু ইতস্ততঃ করে বলল, সে-তো ঠিক মালুম নেই সাব, তবে চটির পেছনে তার আওয়াজ পেয়েছিলাম।

হুঁশিয়ার থেকো।

সই বাত।

দেরি করলেন না প্রদোষ চৌধুরী। তার মনে হল, এখুনি পথ থেকে নেমে জঙ্গলে ঢুকলে বাঘিনীর দেখা পাওয়া যেতে পারে।

উত্তাল নির্জনতা অরণ্য ঢেকে ফেলেছে। খরগোসের মতো ভীরু ছায়া গাছপালার আড়ালে ভিড় করছে।

পথ আর আমলকীবনের মাঝখানের অগভীর খাদটা পেরিয়ে জঙ্গলে পা দিলেন প্রদোষ চৌধুরী। চারদিকে একটা অস্বাভাবিক থমথমে ভাব।

তবে আমলকীবনের তলায় ঝোপঝাড় কম থাকতে মনে মনে স্বস্তি

পেলেন। ভিড় করে থাকা আমলকী গাছের কালো গুঁড়িগুলো যেন ভয় দেখাবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ শুকনো পাতার ওপর দিয়ে ঝড়ের মতো কি যেন একটা ছুটে গেল। ভালো করে নজর করবার আগেই জানোয়ারটা আড়ালে চলে গেল।

থমকে গেলেন প্রদোষ চৌধুরী। আবার সারা জঙ্গল নিঃসাড়। বাঘিনী নয় এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হবার পর পা-টিপে এগোলেন। খানিক এগোবার পর চোখে পড়ল, গাছের কালো গা বেয়ে সাদা আঁঠার মতো ধারা গড়িয়ে যাচ্ছে। কাছে গিয়ে দেখেন বরার দাঁতের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত বাকল; শুয়োরটা হঠাৎ এমন করে পালিয়ে গেল কেন! সম্ভবত তার এগিয়ে আসার সংকেত পেতে ছুটে পালিয়ে গেল নাকি!

এবার প্রদোষ চৌধুরী জোর পায় এগোলেন। সামনে রামগড় পাহাড়ের ছোট্ট শিরাটা পেরিয়ে গেলে তাঁবুর পিছন দিকে পৌঁছবেন। সেখান থেকে খাড়াভাবে নেমে গেলে তাঁবুর সামনে গিয়ে পড়বেন।

আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে হল, সন্ধ্যের মুখোমুখি তাঁবুর সীমানায় পৌঁছে যাবেন। বোধহয় একটু দেরি হয়ে গেল। সবাই বোধহয় ভাবছে। তার আরো আগে পৌঁছে যাবার কথা।

পাহাড়ের পুব দিকে ছায়া নেমে গেছে।

সোজাসুজি নয় এঁকে বেঁকে পথ পার হতে লাগলেন প্রদোষ চৌধুরী। সামনে-পিছনে সমান নজর।

সেই শয়তানীর মতিগতির হিসেব যখন জানা নেই তখন সতর্কতার রাশ এতটুকু আলগা করে দেবার উপায় নেই।

বিকেল বেলার পড়ন্ত আলোয় পাহাড়-জঙ্গল জ্বলছে। মুগ্ধ হবার মতো। বারবার প্রদোষ চৌধুরীকে আনমনা করে দিচ্ছে।

জঙ্গলটুকু পার হয়ে স্বস্তি পেলেন প্রদোষ চৌধুরী। কী জানি কেন যেন তার মনে হচ্ছিল বাঘিনী তাকে চোখে-চোখে রেখেছে। এ রকম মনে হওয়ার সঙ্গত কোন ব্যাখ্যা হয়তো দেওয়া যাবে না। তবু বনের

এলাকা পার হয়ে আসার সময় তার মনে হয়েছিল, মৃত্যু বাঘিনী হয়ে তার ছায়া অনুসরণ করে আসছে। বিশেষ করে শুয়োরটা হঠাৎ ও-রকম ভাবে পালিয়ে যাওয়া তাকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছিল। এখন তার স্পষ্ট মনে হচ্ছে, শুয়োরটা আচমকা বাঘিনীটাকে হাজির হতে দেখে তড়িঘড়ি সরে পড়েছিল। সারাটা পথ অস্বাভাবিক একটা অনুভূতি তাকে শিউরে দিয়ে গেছে।

খোলা যায়গায় পৌঁছে তার ভয় কেটে গেল। এতক্ষণ মনের মধ্যে যে ভার সীসের মতো ভারি হয়েছিল সেটা সরে যেতে মনটা হালকা হয়ে গেছে।

এখানে এই খোলামেলা পাহাড়ের ওপরে যেদিক থেকে আসুক বন্দুকের পাল্লায় তাকে পড়তেই হবে। চারদিকে তাকিয়ে সন্দেহ করবার মতো কিছু মনে হল না।

এবার তাকে নিচে নামতে হবে। আর পনেরো বিশ মিনিটের মধ্যে পাহাড়ের এদিকটা অন্ধকার হয়ে যাবে। এ যাত্রায় আর বাঘিনীর মুখোমুখি হওয়া গেল না। কে জানে আরো কতো দিন এ এলাকার ঘাড়ে আতঙ্ক হয়ে চেপে রইবে।

শরীরটা টানটান করে বন্দুক হাতে উপর থেকে লাফ দিলেন প্রদোষ চৌধুরী। হাত তিনেক নিচে পাথরের চাতালে গিয়ে পড়বেন সেখান থেকে নিচে নেমে যাওয়া সহজ হবে।

প্রদোষ চৌধুরী লাফ দেবার সঙ্গে সঙ্গে বাঘিনী ঝাপিয়ে পড়ল তার ওপর। হাতের বন্দুকটা ছিটকে গিয়ে নিচের দিকে গড়িয়ে যেতে লাগল।

মাথার ওপর সন্ধেতারা উঠেছে।
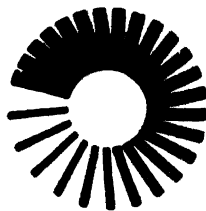
পায়ের শব্দ নিঃশব্দ হয়ে বারান্দায় উঠে এল।

বইয়ের মধ্যে ডুবে ছিল মৃগাঙ্ক। বাইরের আলো কমে এসেছে তাই ঝুঁকে পড়েছে বইয়ের পাতায়। শেষের দিকে রহস্য বুঝি জমজমাট। ডিটেকটিভ গল্পের ধরণই তাই।

মৃগাঙ্কর সামনে আগন্তুক দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ।

মাঠের উপর ছায়া নেমে এসেছে। আবছা অন্ধকার বাতাসে থৈ-থৈ।

নির্জনতার মধ্যে একটানা ঝিঁ ঝিঁ যেন মাকুতে সিল্কের সুতো গোটানোর শব্দের মতো বেজে চলেছে।

মৃগাঙ্কর হুঁস নেই। ঘোর হয়ে এসেছে আলো, তবুও হুঁস নেই।

আগন্তুক এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিঃসঙ্গ একটা তেপায়ার উপর গিয়ে বসল। বসে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। মৃগাঙ্কর চশমা পরা মুখটার দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। সঙ্কোচে তার গলা থেকে স্বর বের হল না।

সারা বাড়িতে কোন সাড়া নেই। মাঝে মাঝে কোথা থেকে যেন

গানের দু' একটা কলি মৌচাক থেকে উড়ে আসা মৌমাছির মতো গুনগুনিয়ে উঠছে।

বইটা বন্ধ করে মাথা তোলে মৃগাঙ্ক। অন্ধকারে হাত কয়েক দূরে ছায়ার মতো কিছু বসে থাকতে দেখে চমকে উঠল সে, কে? তারপর চশমা খুলে চোখ দুটো একটু রগড়ে আবার চশমাটা পরে জিজ্ঞাসা করল, কে—কে ওখানে?

আমি। অন্ধকারই যেন উত্তর দিল।

আমি কে?

রাজসিংহ।

উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে মৃগাঙ্ক বলে, রত্না আলোটা আনো তো—

তার আগেই আগন্তুক সামনে এগিয়ে এল, মেজদা চিনতে পারছ না?

তুই! উত্তর দিতে সময় লাগে মৃগাঙ্কর। সহজে বিশ্বাস করে উঠতে পারে না। তার অজ্ঞাতবাসের ঠিকানা তো সকলের কাছ থেকেই গোপন করে রেখেছে। কলকাতা থেকে ছ'-সাত শ' মাইল দূরে মহারাষ্ট্র আর মধ্যপ্রদেশের সীমানায় বসতিবিরল জঙ্গলের আড়ালে ভাণ্ডারার প্রান্তরে তার ঠিকানা খুঁজে বের করা তো চাট্টিখানি কথা নয়। কেউ খুঁজে পাবে না বলেই তো এইখানে এসে তার সংসার পাতা। ষ্টেশনও কাছে পিঠে নয়। তিন চার মাইলের কম নয়। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথ। একলা সে পথে বড় কেউ আসা যাওয়া করে না। মৃগাঙ্ক মনের মধ্যে হঠাৎ ভেসে আসা এই সব ভাবনাকে ঠেলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুই এখানকার ঠিকানা পেলি কি করে?

হাসল রাজসিংহ। অন্ধকারে সাদা দাঁতগুলো ঝিলিক দিল গোঁফ-দাড়ির আড়াল থেকে, পেলাম। উত্তর দেবার ভঙ্গিতে বোঝা গেল খবরটা বলতে তার অসুবিধে আছে।

তা' হঠাৎ আমার এখানে?

চাকরি বাকরির খোঁজে নয় মেজদা বুঝতেই পারছ। হেসে ফেলল রাজসিংহ, আর সেজন্যে বাংলাদেশ ছেড়ে কেউ এখানে আসে!

তবে?

আমাদের হরগোপাল মল্লিক লেনে নকৃশালদের ভারি উৎপাত। পুলিশ যাকে পাচ্ছে তাকেই বেধড়ক ঠেঙাচ্ছে। তারপর লালবাজার হাজতে ঠেলে দিচ্ছে। তোমার ঠিকানা হাতে আসতে ভাবলাম, যাই দিনকয়েক একটু ঘুরে আসি। হাঙ্গামাটা কমলে চলে যব। মৃগাঙ্কর মুখের দিকে তাকায় না রাজসিংহ। মাথা নিচু করে থাকে। কথা বলবার সময় কারো মুখের দিকে তাকানো তার অভ্যাস নয়।

মাঠ-ভরা গমের ক্ষেতের উপর দিয়ে তিরতির করে বাতাস বয়ে যায়।

স্বচ্ছ অন্ধকার। অস্বচ্ছ আলো। স্বচ্ছ-অস্বচ্ছ আলো-অন্ধকার।

কষ্ট হবে তোর এখানে থাকতে। লোকজন নেই। এমন জায়গায় তুই থাকতে পারবি!

কী করা যাবে। বারান্দার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে উত্তর দেয় রাজসিংহ।

ঘরের ভিতর থেকে একটা আলো এসে দরজার গোড়ায় থমকে দাঁড়াল।

এসো, এসো। মৃগাঙ্ক কাকে যেন আহ্বান করে।

আড়চোখে তাকায় রাজসিংহ।

আমার ছোট ভাই রাজা, ওকে তোমার লজ্জা করতে হবে না। মৃগাঙ্ক সাহস যোগায়, দেখতে অবিশ্যি বড়-সড় হয়ে গেছে। চুলদাড়িতে বয়েসটা ঢাকা পড়ে গেছে দেখছি। চব্বিশ-পঁচিশের বেশি এখনো হয় নি।

আলো হাতে নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায় রত্নাবলী।

লজ্জায় তাকাতে পারে না রাজসিংহ। না তাকিয়েও পারে না। রত্নাবলীর মুখের দিকে তাকিয়ে বিহ্বল হয়ে গেল। তার চব্বিশ-পঁচিশ বছরের কল্পনাকেও ছাপিয়ে যায় এমন চেহারা।

তুমি আগে ওকে দেখনি বোধহয়—? রত্নাবলীর দিকে তাকায় মৃগাঙ্ক।

কাকে আর দেখতে পেলাম! অস্ফুট একটা খেদ রত্নাবলীর গলায়।

তা' বটে—নিজের মনে স্বগতোক্তি করে মৃগাঙ্ক।

রত্নাবলী এগিয়ে এসে টেবিলের উপর আলো রাখল।

সেই আলোতে রাজসিংহকে স্পষ্ট দেখা গেল। লক্‌লকে বেতের মতো একহারা চেহারা। চামড়াটা এককালে বোধহয় ফর্সা ছিল, রোদে পুড়ে বাদামি হয়ে গেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য তার চোখ, ব্লেডের মতো ছক্‌চকে আর ধারালো। কারো দিকে যখন তাকায় মনে হয় ছুরির মতো ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। তেমনি ধারালো চাউনি রত্নাবলীর মুখের উপর ফেলে বলল, বৌদি পরিচয় দেবার মতো কিছু আমার নেই লেখাপড়া বিশেষ—

ঠিক আছে, ঠিক আছে। থামিয়ে দিল মৃগাস্ক' তোকে আর অত বাহানা করতে হবে না।

এবার মাথা তুলে রাজসিংহ বলল, বড্ড খিদে পেয়েছে বৌদি—

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ব্যস্ত হয়ে উঠে মৃগাঙ্ক, বেচারাকে কিছু খেতে-টেতে দাও, কদ্দুর থেকে এসেছে, তারপর কথাবার্তা বলা যাবে—

এসো ঠাকুরপো। স্মিত একটা হাসির রেখা ঢেউ হয়ে গড়িয়ে যায় রত্নাবলীর ঠোঁটে।

রত্নাবলীর পিছনে নিঃশব্দে এগিয়ে যায় রাজসিংহ।

রাজা তোর মালপত্তর কোথায় রাখলি? পিছন থেকে ডাক দেয় মৃগাঙ্ক, কিছু দেখছি নে সঙ্গে?

ভিতরে ঢুকেও থেমে গেল রাজসিংহ, সুটকেশটা ট্রেনে ফেলে এসেছি। নামবার সময় কি রকম ভুলে গেলাম। বোকার মতো হাসে রাজসিংহ।

ভালো। সংক্ষিপ্ত উত্তর শোনা গেল মৃগাঙ্কর, এখানে তো রাত্রের

দিকে এখনো বেশ শীত পড়ে। যা-হোক কিছু একটা জামা-টামা গায় রাখতে হয়।

মুখটাকে কাচুমাচু করে রাজসিংহ বলে, তোমার দু-একটা দিয়ে ম্যানেজ করে নেব মেজদা, কী বল?

হুঁ। অন্য কি একটা ভাবতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেল মৃগাঙ্ক।

ভিতরে ঢুকে যায় রাজসিংহ।

তামাটে-ধূসর শিরীষ গাছটার দিকে চেয়ে বসে রইল মৃগাঙ্ক।

একটু দূরে একজোড়া মাথা তুলে ঠাকুরাণী পাহাড় সতর্ক পাহারা রাখছে দিগন্তে।

মৃগাঙ্কর বাড়ির গা থেকে প্রায় জঙ্গলের সীমানা অবধি পেকে-ওঠা গমের গাছগুলো বাতাসে কাঁপছে। অস্বচ্ছ একটা সোঁদা গন্ধ তাদের ভিতর থেকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাচ্ছে চারদিকে।

দীর্ঘ চার সাড়ে চার বছর বাদে তাদের ঘর-সংসারে এই প্রথম একজন এসে ছিঁড়ে-ফেলা জীবনের সঙ্গে নতুন করে সুতো জুড়ে দিল। না হলে পুরোন পৃথিবী থেকে মৃগাঙ্ক তো নিজেকে একেবারে মুছে নিয়ে এসেছে। তার চিহ্নমাত্র সেখানে কেউ খুঁজে পাবে না। তবু মাঝে-মাঝে অযথা কতকগুলো দীর্ঘশ্বাস মনটাকে কেমন যেন ভারি করে দেয়।

অল্প বয়েসে বিয়ে হয়েছিল মৃগাঙ্কর। ছোটবেলায় বাবা মারা গেছেন। তার থেকেও ছোটবেলায় মা। জ্যাঠামশাই নিজের কাছে রেখে মানুষ করেন। বাইশ-তেইশ বছর বয়েসে ইংরিজিতে এম. এ. পাশ করবার পর জ্যাঠামশাই পাড়ার এক স্কুলে মাস্টারি জোগাড় করে দিলেন। সেকেলে মানুষ তিনি। সময়ে বিবাহকে অত্যাবশ্যক কর্ম বলে গণ্য করতেন। সুতরাং ভাইপোর বিয়ের ব্যাপারে কিছু দেরি করেন নি। ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়া সুন্দরী নয় সুলক্ষণা একটি কন্যার সঙ্গে মৃগাঙ্কর গাঁটছড়া বেঁধে দিলেন। আর তাতেই সুখী হয়ে দিন কাটাচ্ছিল মৃগাঙ্ক মিত্র। কয়েক বছরের মধ্যে মৃগাঙ্কর গুটি তিনেক

ছেলে-মেয়েও হল। সযত্ন চেষ্টায় বন্যাকে ঠেকানো না-হলে আরো হয়ত হ'ত।

না-বালক ভাই-পো সাবালক হয়ে উঠতে জ্যাঠামশাই সম্পত্তির হিসেব-নিকেশ বুঝিয়ে আলাদা করে দিয়েছিলেন। খান দুয়েক বাড়ির ভাড়া আর স্কুল মাষ্টারির আয়ে দিনগুলো তোফা কেটে যাচ্ছিল।

কাজকম্ম বিশেষ কিছু দেখতে হত না। অন্দরমলের অধিষ্ঠাত্রী তরুবালা স্পেনের সম্রাজ্ঞী ইসাবেলার মতো দোর্দণ্ডপ্রতাপে স্বামী এবং তিনটি ছেলেমেয়ের উপর রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছিল। স্বামীর সময় এবং পয়সার হিসেব তার নখদর্পণে থাকত। একটু এদিক-ওদিক উপায় ছিল না। মৃগাঙ্কর নেশা ছিল দু'টো—বই পড়া আর তাস খেলা। তাস খেলা যদিও তরুবালা সইতে পারত, বই পড়া একদম সহ্য করতে পারত না। স্কুল থেকে ফিরে মৃগাঙ্ক যদি কোন বই নিয়ে পড়তে বসেছে অমনি তরুবালা বইটা কেড়ে নেবে, এই তো সারাদিন এত বই পড়িয়ে এলে এখন আবার বই নিয়ে বসা কেন? মৃগাঙ্ক মৃদু আপত্তি করে যদি বলেছে, আরে এ-বই আর সে-বই! থাক্-থাক্। তরুবালার গলায় তখন খেদের খাদ মিশানো বৈরাগ্য, শুধু বিয়ে করেই এনেছিলে, বৌ যে পাখীর মতো খাঁচায় রেখে পোষা যায় না সে কথাটা কোন দিন বুঝলে?

মৃগাঙ্ক বিছানায় গা এলিয়ে বলে, বুঝতে-বুঝতে অনেক লেট হয়ে গেল তরু।

থাক আর ঠাট্টা করতে হবে না।

পেশাদার আর্টিস্টের মতো চোখে জল এনে ফেলত তরুবালা। তাস খেলার আড্ডাটা অবশ্য তরুবালার এক্তিয়ারে নয় তাই রক্ষে। বাড়ির কাছেই একটা কোচিং ঘরে সবাই এসে জমত। সমর চাটুর্য্যে, তারুবাবু, হরেন ওঝা, পটল দত্ত। আরো অনেকে। খেলতে বসলে মৃগাঙ্কর সময় জ্ঞান থাকত না। ঘড়ির কাঁটা কখন বারোটার ঘর পেরিয়ে যেত। তারপর অন্ধ গলির শেষ বাড়িতে এসে কড়া নাড়ত

মৃগাঙ্ক। হাতে অনেকখানি লজ্জা আর সঙ্কোচ জড়ানো থাকত। তবু নাড়তে হত। সাড়া দিত না তরুবালা। শেষে শব্দটা একটু বাড়াতে হত। তাতে লাভ হত এই কড়ার শব্দে তরুবালা না উঠলেও জ্যাঠামশাই উঠে এসে বারান্দায় দাঁড়াতেন, এই ফিরলি নাকি মৃগু?

দেখুন তো জ্যাঠামশাই কেমন আক্কেল। তরুবালাও বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে, ভোর হতে কী আর বাকী আছে! একটা মানুষ যদি সারারাত বাইরে বসে থাকে তা হলে বাড়ির লোকের কী অবস্থা হয়।

জ্যাঠামশাই আর কথা বাড়াতে দিতেন না। বলতেন, বৌমা চাকরটাকে ডেকে দাও দরজাটা খুলে দিক। হতভাগাটা চিরকাল অমনি রয়ে গেল।

মৃগাঙ্ক কোনদিন হয়তো স্কুল থেকে একটু দেরি করে ফিরলে তরুবালার জেরার অন্ত থাকত না। বিরক্ত হত মৃগাঙ্ক তবু কিছু বলতো না। সহ্য করত। তবু একদিন মৃগাঙ্ক বলে ফেলেছিল, তুমি কি আমাকে সন্দেহ কর তরু?

কি জানি বাপু। সারাদিন বাইরে কি কর কে জানে! চারটে বাজলে স্কুলের ছুটি হয়। তখন ফিরতে পারতে, তা নয় সন্ধ্যে না-হলে বাড়ি ফেরার নাম নেই। তোমাদের স্কুলের মাস্টারগুলো সব তোমারই মতো নিষ্কম্মা নাকি!

তুমি বোধ হয় ভাবো তোমার স্বামীকে কেউ ধরে নিয়ে গেল নাকি। তাই না?

তা বাপু আজকাল যা দিন পড়েছে।

কারা ধরতে পারে সে সম্বন্ধে কিছু ধারণা-টারণা করেছ নাকি? চাপা একটা কৌতুক মৃগাঙ্কর মুখে চিকচিক করে।

চোখটাকে হেলিয়ে দেয় মৃগাঙ্কর মুখের উপর তরুবালা, লেখাপড়া জানা বেহায়া মেয়েগুলো অমন সাজগোজ করে বের হয় কিসের জন্যে, পুরুষ ধরবার ফাঁদ ছাড়া ওগুলো আর কী?

তোমার স্বামীকে যদি ধরে নিয়ে যায়।

ছ'দিন পরে রাস্তার এসে ছেড়ে দিয়ে যাবে

হো-হো করে হেসে ওঠে মৃগাঙ্ক।

হাসলে যে?

তোমার কথা শুনে—

কেন আমি কি মিথ্যে বলছি—

এইভাবেই মৃগাঙ্কর দিন কাটছিল।

এক সময় মনে হত অল্প বয়েসে বিয়ে করে জীবনে অভিশাপ নেমে এসেছে। আচার-বিচার সংস্কার-অহংকারে ভরা বেলুনের মতো তরুবালাকে নিয়ে ঠাকুর্দার আমলে হয়তো চলা যেত এ যুগে সে কঠিন সমস্যা! অবনরত স্বামীর অধিকারে হস্তক্ষেপ তার:স্বভাব। একদিন যাকে পেয়ে রাত-ভোর নক্ষত্র ফুল হয়ে থাকত চল্লিশ পার হবার আগে তার সাহচর্যে সুখ ফেরার হয়ে যেত। বাঁধা-ধরা থোড়-বড়ি-খাড়ার জীবন আর ভালো লাগত না। ইংরিজি সাহিত্যের রস নিঙড়ে যে অভিরুচি সোনালি খড় দিয়ে বাসা বাঁধতে চেয়েছিল তার এতটুকু আর অবশিষ্ট ছিল না। মাঝে-মাঝে তার মনে হত নিজে দেখে শুনে একটা লেখাপড়া জানা মেয়ে বিয়ে করলে তার সঙ্গে হয়তো মানসিক সমঝোতায় আসা যেত। এ মেয়ে তো নিজের কথা ছাড়া আর কিছু বুঝতে চায় না। নিজের ঘর-সংসারের বাইরে যে জগৎ আর জীবন তাতে তার প্রয়োজন নেই।

দিন হয়তো এইভাবেই কেটে যেত।

তাসের আড্ডায় তারুবাবু একদিন বললেন, কি হে মৃগাঙ্ক, টিউশনি করবে নাকি? কলেজে পড়ে মেয়েটা—খানদানি বাড়ি—

রক্ষে করুন। তাস শাফলিং করতে করতে উত্তর দিল মৃগাঙ্ক।

দূর ছাই বলে উড়িয়ে দিও না। ভালো টাকা কবুল করেছে।

বিরক্ত হয়ে মৃগাঙ্ক বলল, তারুদা তাসের আড্ডা থেকে আমাকে তাড়াতে চাইছেন কেন?

তাড়াবো কেন বাবা। ভালো পড়াও। মেয়ের বাপ তোমার নাম করেই বলেছে। বেশি দূর নয় এই কাছেই মলিকদের বাড়ি, টিউশনি ফেরতা তাসের আড্ডায় এসে জমতে পারবে। সে দিকে কিছু অসুবিধে হবে না।

কথা দিতে পারছি না তারুদা।

এখুনি কথা দিতে হবে না। তারুবাবুও মৃগাঙ্কর কথায় সায় দিলেন, তুমি বরং কাল চলো আমার সঙ্গে, দেখে শুনে এসে তারপর যা হোক ঠিক করা যাবে।

নিমরাজি গোছের মুখ করে তাকালো মৃগাঙ্ক।

তারুবাবু কানের কাছে মুখ এনে বললেন, মেয়ে বলে কথা, যাকে তাকে তো পাঠাতে পারি না। তোমাকে চিনি, তোমার বাপ-ঠাকুর্দাকে চিনি তাই যা ভরসা! লোক তো কত আছে বললেই বোয়াল মাছের মতো হাঁ করে টোপ গিলে ফেলবে! সবাইকে তো সব জায়গায় দেওয়া যায় না।

রত্নাবলীকে দেখে আপত্তি করতে পারেনি মৃগাঙ্ক। অতৃপ্ত একটা বাসনার সুখ-দুঃখ হঠাৎ যেন ফুল হয়ে উঠল।

তারুবাবু বললেন, রাজি হয়ে যাও ভায়া। ভালো না লাগলে ছেড়ে দিও—

মৃগাঙ্ক ইচ্ছে করেও আপত্তি করতে পারল না! স্কুলের একঘেয়ে পড়ানোর চৌহদ্দি পেরিয়ে এ যেন মুক্তির আশ্বাস।

পড়াতে লেগে গেল মৃগাঙ্ক। পড়াশোনার ফাঁক-ফোঁকরে স্বল্প অবকাশে, কখনো চায়ের কাপ হাতে নিয়ে, দু'একটা বাজে কথার ফুলঝুরি ঝরিয়ে যে উপাখ্যানের সুরু হয়েছিল একদিন আচম্বিতে তার রঙ পালটাল।

ফাল্গুনের এলোমেলো বাতাসে সেদিন মল্লিকবাড়ির জানালায় রঙীন পর্দা উড়ছিল।

পড়ার ঘরে টেবিল ল্যাম্পের ছায়ায় গিয়ে বসল মৃগাঙ্ক।

একটু পরে চা নিয়ে ঢুকল রত্নাবলী। তার হাত কাটা ব্লাউজ গলে বেরিয়ে আসা নিটোল হাতত্নটোর দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ মৃগাঙ্ক বলল, তোমার হাত ত্নটো হাতির দাঁতের মত ফর্সা—

সলজ্জ হাসিকে ঠোঁটের সংযম দিয়ে চেপে রত্নাবলী বলে, কী যে বলেন মাষ্টারমশাই।

সত্যি আমার বউও কম ফর্সা নয় কিন্তু তোমার মত যে নয়, একথা হরফ করে বলা যায়।

উত্তর দিতে পারেনি রত্নাবলী। চা রেখে লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে বসেছে!

সেদিন ওইটুকু। তারপর এই সংলাপের খেই ধরে ঘটনা জলস্রোতের মতো ত্নর্বার হয়ে বয়ে গেল। ত্নপারে তার কচি পাতার সমারোহ। কুসুমে-কুসুমে বসন্ত চিহ্ন!

ঘটনার শেষ পর্যায় মৃগাঙ্ক বলল, জানো তো আমার বউ আছে, ছেলে-পুলে আছে. ভালোবাসার অনেকখানি আগেই খরচা করে ফেলেছি।

মাথা হেলিয়ে রত্নাবলী উত্তর দিল, আমার আর কোন উপায় নেই—

তাহলে? প্রকাণ্ড একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন চোখে ফুটিয়ে তুলল মৃগাঙ্ক।

আমি তার কী জানি। তুমি প্রশ্রয় দিয়েছ তুমিই বুঝবে।

উপায় মৃগাঙ্করও ছিল না। বলল, ত্ন'চারদিন সময় দাও রত্না—

কয়েকদিন ধরে উত্তেজনার তাপে সিদ্ধ হল মৃগাঙ্ক। কি করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। এমন ব্যাপার কাউকে বলা কঠিন। এই বয়েসের-অকাল বসন্ত যে অবৈধ।

ইদানীং তরুবালা গায়ে গতরে যেমন মনেও তেমনি গিন্নি হয়ে উঠেছিল। মৃগাঙ্কর খোঁজ রাখার চেয়ে কেরোসিন তেল ফুরিয়ে গেছে কিনা, কিংবা কবে ঘুটে রাখতে হবে এসব তার কাছে বেশি দরকারি

বলে মনে হত। নির্জন ঘরে মৃগাঙ্ক তুজনের মধ্যে কখনো বিহ্বল বসন্তের একটুখানি আনতে চাইলে তরুবালা ঠোঁট উলটে দিয়েছে, অত আদিখ্যেতা এ বয়সে আর ভাল লাগে না বাপু।

কত সময়ে মৃগাঙ্কর মনে হয়েছে, এ সংসারে তার বুঝি প্রয়োজন নেই। ছেলেমেয়েরা দিন রাত্তির তার সঙ্গ না পেয়ে অন্যভাবে বড় হয়ে উঠেছে। বাবার কাছে দরকার না-হলে আসতে চায় না।

সংসারের যখন এই রকম অবস্থা ঠিক সেই সময় মৃগাঙ্ক রত্নাবলীর সান্নিধ্যে নতুন এক স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছিল। সম্ভবত নতুন জীবনেরও।

কাউকে কিছু না-বলে আমহার্স্ট স্ট্রীটের দোতালা বাড়িটা পঁচাত্তর হাজার টাকায় বিক্রি করে দিল। তারপর একবার ছুটিতে বেড়াবার নাম করে বেরিয়ে পড়ল নতুন একটা জায়গার সন্ধানে, যেখানে রত্নাবলীকে নিয়ে নিরিবিলিতে নীড় বাঁধতে পারে। কেননা রত্নাবলীর বাবার কলকাতায় যা প্রভাব-প্রতিপত্তি তাতে কাছাকাছি কোথাও নিশ্চিন্তে ঘর বাঁধা যাবে না। তাই অদূর থেকে দূরের দিকে তার নজর দিতে হল।

রায়পুর থেকে জব্বলপুর যাবার পথে জঙ্গলের আড়ালে ঢাকা এই এলাকা দেখে বাস থেকে নেমে পড়ল মৃগাঙ্ক। আশে পাশে ছোট ছোট বসতি। মাঠভরা গরু-মোষের পাল চলে ফিরে বেড়াচ্ছে কাছাকাছি পাহাড় থেকে একটা জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে। তারি গা-ঘেঁষে এক ঝাঁক পাহাড়ি বাবলার গাছ বাতাসে হলুদ ফুলের রঙ ছড়িয়ে দিয়েছে। আকাশের নীল আর বনের সবুজে একাকার। আলোয়-বাতাসে কিশোরী বসুন্ধরা সবুজ আঁচল পেতে সাদর অভ্যর্থনা বিছিয়ে রেখেছে।

ভারি ভালো লেগে গেল মৃগাঙ্কর। মনে হল তার স্বপ্নেও বুঝি এই জায়গাটার খবর ছিল।

আলাপ হল চনিলালের সঙ্গে—সেই বলল, এখানে দু'দিন থাকুন, দেখুন ঘুরে ফিরে তারপর সব ব্যবস্থা করে দেব।

নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল চনিলাল। একসার মহুয়া গাছ দিয়ে ঘেরা তার বাড়ি। চনিলাল আদর করে বলে, মহুয়া নিকেতন।

সেইখানে থেকে পনেরো হেক্টর জমি বাইশ হাজার টাকা দিয়ে কেনবার ব্যবস্থা করে ফেলল মৃগাঙ্ক।

চনিলাল বলল, এখানকার লোকেরা বাহারি জমি বলে। তিনটে ফসল হয়, ধান গম আর মোমফলি। মাটিতে যা ফেলবেন সোনা হয়ে উঠে আসবে।

মিথ্যে বলে নি চনিলাল। যতোখানি চাষ করতে পেরেছে, তাতে সোনাই উঠে এসেছে।

সব ব্যবস্থা করে ফিরে গেল মৃগাঙ্ক।

চনিলাল আশ্বাস দিল, ঘর তোলার ব্যবস্থা আমার হাতে রইল।

শীতের আগে ফিরে আসবে এই কথা দিয়ে কলকাতায় ফিরে এল মৃগাঙ্ক।

তারপর রত্নাবলীকে নিয়ে যাবার পালা।

রত্নাবলী প্রস্তুত ছিল। সকলের অজান্তে একদিন তু'জনে বোম্বে মেলে চড়ে বসল।

ঘরের ব্যবস্থা করে রেখেছিল চনিলাল। সেখানেই এসে উঠল তুজনে।

মৃগাঙ্কর ভাগ্য ভালো জায়গাটা রত্নাবলীরও খারাপ লাগে নি। চার-পাঁচ বছর সুখে-তুঃখে কেটে গেছে। কলকাতা ছেড়ে আসার জন্যে এতটুকু অনুশোচনা মৃগাঙ্কর মনে আসে নি।

অন্ধকার চৌকাঠ পেরিয়ে রত্নাবলী চা এনে রাখল

ভালোই হল।

কেন ?

তুমি একজন কথা বলার লোক পেলে।

কথা বলার লোক না ছাই—সাত বার জিজ্ঞাসা করলে তবে একটা উত্তর পাওয়া যায়। অমন লোকের সঙ্গে কথা বলার সুখ থাকে না!

তোমাকে বোধহয় লজ্জা পাচ্ছে—

মাথা তুলেই তাকাচ্ছে না আমার দিকে মাথা নিচু করে চাইছে। ওর চাউনিটা মোটেই ভালো নয়—

কেন তোমাকে কি গিলে খাচ্ছে? ঠাট্টা করে মৃগাঙ্ক।

আঃ! ধমক দেয় রত্নাবলী।

কি করছে এখন রাজা?

খাচ্ছে।

আমি একটু চনিলালের ওখান থেকে ঘুরে আসি, রাজা রইল।

এই রাতে, সেদিন তো চিতাটা আমাদের বেড়া পর্যন্ত এসেছিল মুরগির লোভে—

বন্দুক নিয়ে যাব।

যা ইচ্ছে করো গে, রাগ করে রত্নাবলী, জ্যোৎস্না রাতে চারদিক তবু দেখা যায়, তোমার ফসলের লোভে চিতলেরা দল বেঁধে এলে চিতাটাও এসে হজির হতে পারে।

এই সন্ধ্যেবেলা কী আর হরিণেরা আসবে—

রাজসিংহ খেয়ে উঠে এল।

এই যে রাজা, তোমার বৌদির সঙ্গে গল্প কর। আমি একটু ঘুরে আসি, আর শোন, এই জালে ঘেরা বারান্দার বাইরে একদম নামবে না।

কেন?

জঙ্গল থেকে জীবজন্তু এসে পড়তে পারে।

বাঃ ভারি মজা তো! ছোট ছেলের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে রাজসিংহ।

এরা কিন্তু তোমাদের চিড়িয়াখানার পোষা জানোয়ার নয়, বেমক্কা পেলে হরিণই হোক আর চিতা হোক মাটিতে ফেলে দিয়ে যাবে।

তা সত্যি। রত্নাবলী কথার মাঝখানে যোগ দেয়, তোমার দাদা তো

একবার হরিণের পালের দিকে এগিয়ে ছিল সাহস করে, ওঃ বাব্বা, ভয় তো তারা পেলই না, এমন কি তাদের একটা তোমার দাদার দিকে তেড়ে এল। আমি তো বারান্দা থেকে চেঁচিয়ে মরি—

কি ভেবে সেটা আর এগোল না তাই রক্ষে—

বন্দুকটা হাতে নিয়ে জালের দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল মৃগাঙ্ক, আমি আসছি—

বেশি রাত করো না কিন্তু—রত্নাবলী মৃগাঙ্ককে সাবধান করে দিল।

আচ্ছা-আচ্ছা। গমের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে সাড়া দিল মৃগাঙ্ক।

জালের দরজাটা টেনে দিল রত্নাবলী।

অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল রাজসিংহ। বলল, তোমরা কিন্তু সুখে আছ বৌদি।

কি রকম ?

তোমরা তো থেকেও পৃথিবীতে নেই। কলকাতা শহরে আমরা সকাল থেকে ঘুমানোর আগে পর্যন্ত নানারকম অসুখে ভুগি—সে সবের হাত থেকে তোমরা রেহাই পেয়ে গেছ।

দু দিন থাক তারপর বুঝবে।

কা বুঝব ?

এখানে থাকার সুখ।

হো হো করে হেসে ওঠে রাজসিংহ, তাই বল।

সকালে উঠে মৃগাঙ্ক দেখে রাজসিংহর ঘর খোলা। ঘরের ভিতর উঁকি দিল না, বিছানায়ও নেই। অবাক হয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। এমনটা তো হবার কথা নয়! রত্নাবলীকে জিজ্ঞাসা করে মৃগাঙ্ক, রাজা তোমাকে কিছু বলেছিল, কোথাও যাবে-টাবে ?

না তো।

দেখ দিখিনি কী বিপদ, সকালে উঠে না বলে কোথায় বেরিয়ে পড়েছে, অপরিচিত পথঘাট, জঙ্গলের পথ হারিয়ে না ফেলে—

তোমার কী রকম ভাই গো?

জ্যাঠতুতো ভাই। জ্যাঠামশাইয়ের ছোটছেলে—

এখানে থাকবে নাকি?

বলছে তো, নকশালদের হাঙ্গামার ভয়ে পালিয়ে এসেছে—

খোঁজ খবর করতে আসে নি তো?

বুঝতে পারছি না। সংশয় দোলা দেয় মৃগাঙ্ককে, সে ভাবনা পরে ভাবা যাবে। এখন ভাবছি ছেলেটা গেল কোথায়—

কোথায় আর যাবে। আছে কাছাকাছি কোথাও—

বন্দুকটা একবার দাও তো।

রত্নাবলী বন্দুকটা আনতে ঘরে ঢুকল।

ফার্মের বেড়ার ওপাশে রাজসিংকে দেখা গেল হাঁপাতে-হাঁপাতে আসছে। বারান্দা থেকে নেমে মৃগাঙ্ক এগিয়ে গেল, এত সকালে কোথায় গেছিলি।

কথা বলবার আগে হাসে রাজসিংহ, মুরগির লোভে বেরিয়েছিলাম—

মুরগির লোভে!

ঘুম থেকে উঠে দেখি একজোড়া বন-মুরগি তোমার ফার্মের ভিতর ঘোরাঘুরি করছে। তাড়া করলাম, দেখি ধরা যায় কি না। লোভ দেখিয়ে জঙ্গলের ভিতর টেনে নিয়ে গেল। তারপর ডানার ঝাপটায় খানিকটা বাতাস ছিটিয়ে দিয়ে কোথায় বেপাত্তা হয়ে গেল। এদিক-সেদিক খানিক খুঁজে শেষে নিজেই পথ হারিয়ে ফেললাম। মাথা নাড়ে রাজসিংহ, আর বেরুতে পারি না জঙ্গল থেকে—

বন-মুরগি কেউ হাত দিয়ে ছুঁতে পারে! মৃগাঙ্কর ভুরু ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মতো টান-টান হয়ে যায়, শটগানের গুলি যখন ওদের মাটিতে ফেলে দেয় তখনই ছোঁয়া যায়। তোর পাগলামি যদি তোকে আরেকটু জঙ্গলের মধ্যে টেনে নিয়ে যেত তবে মুশকিল হত তোর পক্ষে ফেরা—

রত্নাবলী পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল বন্দুক নিয়ে—বলল, চারদিকে ঝপ করে যা কুয়াসা নামল তুমি পথ হারিয়ে ফেলতে ঠাকুর পো!

বাচ্চা ছেলের মতো দাঁত বের করে হাসে রাজসিংহ, খুব ভালো হত তা হলে—

হারালে বুঝতে !

তুমি এখন একটু চা দেবে ? মৃগাঙ্ক রত্নাবলীর দিকে ফিরল।

চায়ের জল তো কখন থেকে ফুটে যাচ্ছে—

একটু তাড়াতাড়ি করো, রোদ ওঠবার আগে পেস্টিসাইড স্প্রে করতে হবে। মৃগাঙ্ক রাজসিংহের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, হ্যাঁরে জ্যাঠামশাই কেমন আছেন ?

ভালোই। মাথার এলোমেলো চুলগুলো আঙ্গুল দিয়ে একটু গুছিয়ে দেয় রাজসিংহ, অই মাঝে-মাঝে বাতের ব্যথায় একটু যা কষ্ট পান।

বাজারে যান এখনো ?

যান কখনো লাঠি নিয়ে ঠুক ঠুক করে—

একটা গমের শিস নাড়াচাড়া করতে করতে মৃগাঙ্ক জিজ্ঞেস করে, আমার কথা কিছু বলেন ?

মাথা নাড়ে রাজসিংহ, না। তারপর বলে, যা কাণ্ড তুমি করলে, বাবার তো মাথা কাটা যাবার দাখিল। তারপর আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িটা কাউকে না বলে বিক্রি করে দিয়েছ এতে বাবা আরো দুঃখ পেয়েছেন।

তুই এখানে আসবি শুনে কিছু বলেন নি ?

কেউ জানে নাকি আমি এখানে আসব। তোমার ঠিকানাটা পেয়ে টুক করে কেটে পড়েছি।

রত্নাবলী দরজায় দাঁড়িয়ে ডাক দিল, এসো তোমার চা হয়ে গেছে।

চ' রাজা চা খেয়ে আসি।

যেতে-যেতে রাজসিংহ বলে, মেজদা তোমার গমের গাছে ওষুধ ছড়ানোর ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দাও না—

পারবি তুই ? মুখ ফিরিয়ে তাকায় মৃগাঙ্ক।

একবার দিয়েই দেখ না।

মৃগাঙ্ক, রত্নাবলী আর রাজসিংহ তিনজনে একসঙ্গে চা খেতে বসল।

জানো রত্না। চায়ে চুমুক দিয়ে মৃগাঙ্ক বলে, রাজা ফসলে ওষুধ ছড়াতে চাইছে।

ভালোই তো।

আমি ভাবছি, রাজা যদি ওষুধ ছড়াতে যায় আমি তা'হলে আজকের টেবিলে লেগহর্ন হাজির করবার ব্যবস্থা করি গে—

উঁ-হুঁ-হুঁ। আপত্তি করে রত্নাবলী নিজের হাতে বড়-সড় করে ওদের আমি খেতে পারব না তা আগের থেকে বলে রাখছি—

তা চল না মেজদা, জঙ্গল থেকে গোটা কয়েক বন-মুরগি মেরে আনি—

আজ থাক। আপত্তি করে মৃগাঙ্ক, আরেকদিন যাওয়া যাবে।

মুখটা কী রকম যেন করে রাজসিংহ। তুমি সেই আগেকার মতোই আছ মেজদা! চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে পড়ে রাজসিংহ, আমাকে বরং ওষুধটা বের করে দাও স্প্রে করবার ব্যবস্থা করি। দরজার কাছ অবধি গিয়ে থামে রাজসিংহ? তোমার বন্দুকটা নিয়ে একদিন শিকার করতে যাব ভাবছি—

কি শিকার করবি? মৃগাঙ্কও উঠে পড়ে।

বাঘ-ভাল্লুক যা' পাব।

তুমি বন্দুকটা চালাতে জানো ঠাকুরপো? কাপ-ডিস গোছাতে-গোছাতে প্রশ্ন করে রত্নাবলী।

ছোটবেলা থেকে এন. সি. সি ট্রেনিং নিতে গিয়ে রপ্ত হয়ে গেছে বৌদি।

তা হলে তো ভালোই। আগে পাখি-টাখি মেরে হাত পাকাও, তারপর বাঘ-ভাল্লুকের গায়ে হাত দিও—। রত্নাবলীর ঠোঁট থেকে একঝাঁক হাসি বাতাসে উড়ে যায়।

উত্তর দেয় না রাজসিংহ। শুধু বোকার মতো রত্নাবলীর মুখের দিকে একবার তাকায়।

মৃগাঙ্ক ওষুধ আনতে স্টোর-রুমে গেছে।

কাপ-ডিস খাবারের প্লেট গুছিয়ে রাখতে রত্নাবলীও চলে গেল।

রাজসিংহ একলাই দাঁড়িয়ে রইল বারান্দায়, তারপর সোনার দানার মতো পেকে ওঠা গমের ক্ষেতের ভিতর নেমে গেল।

কুয়াশা কেটে গিয়ে রোদ উঠেছে।

ঝাঁক বেঁধে উড়ে এসেছে ফড়িংয়ের দল।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ঠাকুরাণী পাহাড়ের দিকে তাকাতে খুশিতে শিস দেয় রাজসিংহ।

ভর-দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে জানালায় এসে দাঁড়ায় রত্নাবলী। জানালার চৌকাঠে অলস দুপুর বাঁধানো ছবির মতো স্থির হয়ে গেছে।

গুটিকয় হলুদ প্রজাপতি বাতাসে ভর দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।

সেদিকে তাকিয়ে ঘুম-ঘুম চোখে হাই তোলে রত্নাবলী। চোখের পাতা ভার হয়ে থাকে। শুতে ইচ্ছে করে তবু শোয় না। দুপুরে খাবার পর মৃগাঙ্কর একটু গড়ানো অভ্যাস। রত্নাবলীকেও বলে, তুমি একটু গড়িয়ে নিলে পার।

মাথা নাড়িয়ে আপত্তি করে রত্নাবলী, না বাবা, ঘুমুলে শরীর আরো মুটিয়ে যাবে। হাই তোলে রত্নাবলী।

মল্লিকদের তিনমহলা বাড়িটা রত্নাবলীর চোখে এখন স্বপ্ন হয়ে গেছে। এখন দুপুরবেলা মল্লিকবাড়ির ঠাকুরদালানে পায়রার ঝাঁক নেমেছে। ছাদে আচার মেলে দিয়ে ঠাকুমা চিলেকোঠার ঘরে বসে কাক তাড়াচ্ছেন আর রামায়ণ পড়ছেন। বাবাও হয়তো ঘুম থেকে উঠে হাঁক দিচ্ছেন, ফিরিঙ্গি। সদরে দারোয়ানগুলো খাটিয়া পেতে নাক ডাকাচ্ছে। একটু পরেই বিশে নাপিত এসে বাবার বিকেলবেলার কাপড় কোঁচাতে বসবে।

কী জানি মা এখনো হয়তো দুপুরে না ঘুমিয়ে ক্ষীরের খাবার তৈরি করে। ছোট ভাইটা দুপুরের আনাচে-কানাচে এখনো কি বেড়ালের মতো ঘুরে বেড়ায়। এই চার-পাঁচ বছরে সে আরো বড় হয়েছে। তার

দিদি হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেল সেকথা একবারও ভাবে কি না কে জানে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রত্নাবলী।

মল্লিকবাড়ির রাজপ্রাসাদ থেকে নিজের খামখেয়ালিতে জনমানবহীন এ কোন বনজঙ্গলে এসে সংসার পাতল রত্নাবলী। এই কী সে চেয়েছিল! ইচ্ছে-অনিচ্ছের কথা রত্নাবলী জানত না। এখনো হয়তো জানে না। তবু মাঝে-মাঝে মনে হয় এই অসীম নিরুদ্বিগ্ন জীবন যেন আর ভালো লাগে না। এই সুখও অসহ্য।

বাড়িতে ফিরে যেতে খুব ইচ্ছে করে রত্নাবলীর। সাহস পায় না। কত সাধ-আহ্লাদ তাকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল বা-বাবার মনে। বনেদি বড়-বড় বাড়ি থেকে বিয়ের সম্বন্ধ আসতে শুরু করেছিল। বাবার সেই এক ধনুক ভাঙা পণ, বি. এ. পাশ না করিয়ে মেয়ের বিয়ে দেবেন না।

ঠাকুমা রাগ করতেন, হ্যাঁরে নেপেন, মেয়েকে আর কতদিন আইবুড়ো রাখবি বাবা?

বি. এ-টা পাশ করতে দাও না মা।

লজ্জার কথা বাবা! মল্লিকবাড়ির মেয়ে কোনদিন তো চোদ্দ পার হতে দেখি নি।

মা বলতেন, হ্যাগা মেয়ের এত সব ভালো-ভালো সম্বন্ধ আসছে, আর দেরি করা কি ঠিক হবে?

বাবা গড়গড়া টেনে যেতেন, উত্তর দিতেন না প্রথমটা। তারপর গড়গড়ার নল থেকে মুখটা সরিয়ে নিয়ে বলতেন, লোকে বলে, মল্লিকদের উপর লক্ষ্মী চিরকাল সদয়া, সরস্বতীর তেমন নেক-নজর নেই, রত্নাকে বি. এ পাশ করিয়ে এটাকে খণ্ডাবো, বুঝেছ গিন্নি! আবার গড়গড়ার নল মুখে নিয়ে চোখ বুজে একটানা টেনে যেতেন খানিকক্ষণ তারপর বলতেন, একটু ধৈর্য ধর গিন্নি, তোমার মেয়ের বর ঠিক সময়মত এসে পৌঁছবে।

রত্নাবলী হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে ইংরিজিতে অনার্স নিয়ে

কলেজে ভর্তি হল। তখনই পড়াতে এল মৃগাঙ্ক। বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি হলে কি হবে, দেখে মনে হত আটাশ-উনত্রিশের বেশি কিছুতেই নয়। মাথার উপর একরাশ কালো চুল বাতাসে কাটাকুটি খেলত।

প্রথম প্রথম মৃগাঙ্ককে কী রকম গম্ভীর মনে হত। পড়াশোনার বাইরে এতটুকু কথা হত না। বাইরে থেকে মৃগাঙ্ককে একেবারেই ধরাছোঁয়া যেত না। তখন কী যেন একটা সেণ্ট ব্যবহার করত মৃগাঙ্ক। পকেট থেকে রুমাল বের করলেই খানিকটা গন্ধ ঘরময় হরিণের মতো চমকে উঠে ছোটাছুটি করত। সেই গন্ধের সিঁড়ি বেয়ে রত্নাবলী মৃগাঙ্কর মনের নাগাল পেতে চাইত। অনর্গল কথা বলে যেত মৃগাঙ্ক। তার চোখ দুটো বাইরে দূরে কোথায় যেন ঘুরে বেড়াত। কখনো অজান্তে এসে রত্নাবলীকে ছুঁয়ে যেত। কী রকম একটা অনুভব তখন যেন তাকে জড়িয়ে ধরত।

রত্নাবলী মুখ নিচু করে যখন প্রশ্নের উত্তর লিখে নিত তখন মৃগাঙ্ক সাগ্রহ কৌতূহলকে আটকে রাখতে পারত না। অপলক হয়ে থাকত রত্নাবলীর দিকে, কখনো তার হাতের কাঁকনে, কখনো অনামিকার জ্বলেজ্বলে চুণীটার দিকে। লিখতে লিখতে আড়চোখে মৃগাঙ্কর দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিয়েছে রত্নাবলী।

একটু করে শীতের বরফ গলেছে। জমাট বরফ নদী হয়ে বয়ে গেছে। তার এপারে ওপারে একটা দুটো ঘাসের পাতা, কোথাও একগুচ্ছ রক্ত-পীত কুসুমের উঁকিঝুঁকি কি বসন্তের খবর এনেছে।

রত্নাবলী জানতো, মৃগাঙ্ক সংসারী। বিয়ে করেছে। দু' তিনটে ছেলেপুলে। তবু কি দেখে সে মায়াবী মোহের আঁচল ধরে পথে বেরিয়ে এসেছিল। কে জানে! আজ আর জেনে লাভ কি! তবু মাঝে-মাঝে মনে কেমন যেন অসুখ করে। কিচ্ছু ভালো লাগে না। ইচ্ছে করে, ঘর অন্ধকার করে কাঁদে। মনে কেন যে কান্না জমে রত্নাবলী তা কিছুতে বুঝতে পারে না। বলতে গেলে, সুখেই তো সে আছে।

মৃগাঙ্কর তো কোন দোষ নেই। সে তো বারবার বলেছে, তুমি ভুল করছ রত্নাবলী। বাতাসে উড়িয়ে দেবার মতো ভালোবাসা সব খরচা করে ফেলেছি। বুকের মধ্যে যেটুকু আছে তা ভালোবাসা বটে, তবে অষ্ট্রিচের মতো তার ওড়বার ক্ষমতা নেই! উড়তে গেলে মাটিতে ডানা ঝাপটানো সার হয় আকাশে পাখা মেলে দিতে পারে না।

রত্নাবলী শোনে নি। বলেছে, তুমি দূরে কোন জায়গা দেখ, সেখানে গিয়ে থাকব। বাবার জন্যে কাছাকাছি থাকতে সাহস হয় না। রাগী মানুষ কখন কী করে বসেন কে জানে!

ভাবনার মধ্যে ডুবে থাকে রত্নাবলী। হলুদ প্রজাপতির দল কোথায় ফেরার হয়ে যায় কে জানে।

ঘুমের জাহাজ গ্যালীবোটের মতো রত্নাবলীর চোখের উপকূলে এসে নোঙর করে।

সারা বাড়ি নিঝুম।

মৃগাঙ্ক এখন ঘুমুচ্ছে। হয়তো রাজসিংহও। ঘুম রত্নাবলীর চোখে আসে তবে ঘুমুতে পারে না সে। কী রকম একটা ছটফটানি তাকে সারাটা দুপুর দুরন্ত করে রাখে।

হঠাৎ কে যেন রত্নাবলীর চোখ চেপে ধরে হাত দিয়ে।

ও মা, কে গো! চমকে ওঠে রত্নাবলী।

হাত দুটো সরিয়ে নিয়ে রাজসিংহ হি-হি করে হাসে, আমি বৌদি!

তুমি! রত্নাবলীর চোখের পলক পড়তে চায় না।

তোমাকে ভয় দেখাচ্ছিলাম।

রাজসিংহের সাহস দেখে অবাক হয়ে যায় রত্নাবলী। এই তো দু'তিন দিন আগে সবে এখানে এল এরই মধ্যে এত সাহস রত্নাবলীর গায়ে হাত দেয়। ছেলেটা কী বোকা! বয়েস তো কম হল না, বুদ্ধি-সুদ্ধি কিছু গজায় নি নাকি! কোনটা ভাল কোনটা মন্দ তার হিসেব-নিকেশ বোঝে না—না, অন্য কিছু!

কী কথা বলছ যে বৌদি? খুব ভয় পেয়ে গেছ বুঝি!

মনের ভাবনা মনের মধ্যে চেপে রেখে রত্নাবলী বলে, তুমি ঘুমোও নি ?

দূর্, ঘুমুতে-টুমুতে আমার আর ভালো লাগে না। রাত্রেই ঘুম আসে না, আর দুপুরবেলা !

এই দুপুরে রোদে কী করছিলে ?

দাদার বন্দুকটা খুঁজছিলাম। বোকার মত হাসে রাজসিংহ, বন্দুকটা কোথায় রাখে বলো তো ?

তা কি করে বলব। তোমার বন্দুকের দরকার কি ?

এই একটু জঙ্গলে বেরুব ভাবছিলাম। তা' বন্দুকটা যখন পেলাম না তখন কি করা যাবে, ঠাকুরাণী পাহাড়ের দিকে গেছিলাম।

বলো কী !

নাঃ, গিয়ে পৌঁছতে পারিনি। কাছাকাছি গিয়ে ফিরে এলাম।

কেন ?

বড্ড ভয়-ভয় করছিল। শুধু হাতে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পাহাড়ে উঠতে সাহস হল না। তা ছাড়া কি রকম বোঁট্কা একটা গন্ধ নাকে এল। বাঘ-টাঘ হবে বোধ হয়—

দিনের আলোয় বাঘ আসবে কোথা থেকে—

কী জানি! অন্যমনস্ক হয়ে গেল রাজসিংহ তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, চনিলালের বাড়িটা কোথায় বলো তো বৌদি ?

ওই তো মাঠের ভিতর মহুয়া গাছের আড়ালে। যাবে নাকি সেখানে ?

ভাবছি। দুপুরবেলা তোমাদের সবাইকে ঘুমে পায় আমি কি করি বলো তো ?

ভ্যারেণ্ডা ভাজো গিয়ে। হেসে সরে যায় রত্নাবলী। কান্হার আসবার সময় হয়ে গেছে। তাকে রান্নাঘর থেকে থালা বাসন বের করে দিতে হবে।

রত্নাবলী পিছন ফিরে দেখে রাজসিংহ পড়ন্ত রোদের আলোয় মাঠের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

রত্নাবলী ইচ্ছে করছিল রাজসিংহকে ডেকে বলে, ঠাকুরপো দাঁড়াও, আমি তোমার সঙ্গে যাব। অথবা তোমার সঙ্গে আমার যেতে ইচ্ছে করছে। নিয়ে যাবে? ইচ্ছেটা বুকের ভিতর মরে রইল।

বহুদিদি। কান্‌হার মা এসে দাঁড়ায় দরজার বাইরে।

এই যে, যাই। ব্যস্ত হয়ে ওঠে রত্নাবলী।

হ্যাঁ গো, চা হয়েছে। ঘুম থেকে উঠে এল মৃগাঙ্ক।

হয়নি। এবার হবে। হাসি-হাসি মুখ করে রত্নাবলী বলে, চা-টা খেয়ে একটু চলো না, একটু মাঠের ভিতর থেকে ঘুরে আসি—

ধুর। মুখ ফিরিয়ে নিল মৃগাঙ্ক, কি হবে শুধু শুধু ঘুরে।

রোজ বিকেলে ঘরে আটকে থাকতে আর ভালো লাগে না। তোমার সংসারে কতদিন আর গিন্নি সেজে থাকব! হঠাৎ যেন মুখ ফিরিয়ে চলে গেল রত্নাবলী।

মৃগাঙ্ক একদিন জিজ্ঞাসা করল, রাজাকে কেমন মনে হচ্ছে?

কেন বলো তো?

এমনি বলছি, না, মানে, রাজার ধরণ-ধারণ চিরকাল আলাদা রকমের। পড়াশুনো তো তেমন হল না। অনেক চেষ্টা করেছিলেন জ্যাঠামশাই। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দিনরাত আড্ডা দিয়ে একেবারে বকে গেছে। তারপর একটা কাণ্ড এমন করে ফেলল তা সামলাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল আমাদের। তারপর থেকে কী রকম যেন পালটে গেল। বাড়িও থাকত না সবদিন। কোথায়-কোথায় ঘুরে বেড়াত।

কী কাণ্ড?

পাড়া থেকে কোথায় গিয়ে আড্ডা দিত রাজা, সেখানে জানালায় উঁকি-ঝুঁকি দেওয়া একটা মেয়ের সঙ্গে রাজার ভালোবাসা হল। রাজার স্বভাবই এমনি একটুতে মন ভরে না, সবটুকু পাওয়া চাই। যে রহস্য

মেয়েটাকে ঘিরেছিল তাকে হাত দিয়ে ছুঁতে চাইল। তাতেই বাধল মুশকিল! একদিন সকালবেলায় মেয়েটা তার এক দাদাকে নিয়ে জ্যাঠামশাইয়ের বৈঠকখানায় ঢুকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে দাঁড়াল।

জ্যাঠামশাই অবাক হয়ে বললেন, তুমি কে মা?

মেয়েটির দাদাই উত্তর দিল, আপনার ছেলের বৌ—

এ্যাঁ! লাফিয়ে উঠলেন জ্যাঠামশাই, তোমরা বোধ হয় ভুল করে অন্য বাড়ীতে ঢুকেছ বাবা!

আপনার নাম যাদুগোপাল মিত্র তো?

এতকাল তো তাই জেনে এসেছি।

রাজসিংহ তো আপনারই ছেলে?

অত খোঁজ-খবরের দরকার কী হে? যা বলবার বলে ফেল—

আপনার ছেলে এই মেয়েটিকে বিবাহ করেছে।

আমার ছেলে! আকাশ থেকে পড়লেন জ্যাঠামশাই, আমার ছেলে বিয়ে করেছে এই মেয়েটিকে, বাংলাদেশে কী মেয়ের অভাব পড়েছে। এসব বুজরুকা গল্প আমি বিশ্বাস করি না, মানে-মানে এখান থেকে সরে না পড়লে পুলিশে খবর দেব। উত্তেজনায় জ্যাঠামশাই কাঁপছিলেন।

আপনি যদি এই মেয়েটিকে আপনার ছেলের বৌ হিসেবে গ্রহণ না করেন তবে পুলিশে আমাদেরই খবর দিতে হবে। মেয়েটির দাদাও উলটে চড়াও হল।

আমার ছেলের বিয়ে, আর আমি কিছু জানি না! জ্যাঠামশাই ফেটে পড়লেন রাগে।

এবার মেয়েটি শান্ত গলায় বলল, রাগ করবেন না। আপনি বুড়ো মানুষ। আপনার সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়াকি করবার জন্যে এখানে আসি নি। বিপদে পড়েই এসেছি।

মেয়েটির দাদা বলল, আপনার ছেলের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্যে মেয়েটি এখন গর্ভবতী। বাড়ির আশ্রয় হারাতে বসেছে। নিরুপায়

হয়েই আপনার কাছে আসতে বাধ্য হয়েছে। বিশ্বাস না হয় আপনার ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেই সব জানতে পারবেন।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে জ্যাঠামশাই বললেন, বেশ তাই ডাকছি। রাজা—হাঁক দিলেন তিনি, হতভাগাটা আসুক আগে, তারপর দেখছি—

রাজা তখন কোথায়! সে হতভাগা তখন বেপাত্তা। সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে টিকিট পাওয়া গেল না তার। চাকরটা বলল, এইমাত্তর দাদাবাবুকে তার নিজের ঘরে বসে চা খেতে দেখলাম।

জ্যাঠামশাইয়ের বুঝতে অসুবিধা হল না, ব্যাপারটা খুব গোলমেলে।

একেবারে নরম নরম হয়ে হয়ে গেলেন তিনি। বললেন, মা লক্ষ্মী সত্যি যদি তুমি আমার ছেলের বৌ হও তবে ঘরে নিতে হবে বৈকি—পাড়ায় আমার মান সম্মান আছে, আমার ছেলের বৌকে তার উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে ঘরে তুলতে হবে। এখুনি তো সম্ভব নয়, খোঁজ খবর নিই তারপর ব্যবস্থা করব।

মেয়েটির দাদা যাবার সময় শাসিয়ে গেল, ব্যবস্থা নিতে দেরি হলে, আদালতের সাহায্য নিতে বাধ্য হবো।

রাজার কাণ্ড-কারখানা দেখে জ্যাঠামশাই হতভম্ব হয়ে গেছিলেন। কি করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। সবাইকে ডাকলেন তিনি। বললেন, খোঁজ-খবর নিয়ে দেখ তো ব্যাপারটা কি!

খবর নিয়ে দেখা গেল ব্যাপারটা সত্যি।

জ্যাঠামশাই বললেন, সত্যি হোক আর মিথ্যে হোক এমন মেয়েকে ছেলের বৌ বলে ঘরে তুলতে পারব না।

সবাই তখন পরামর্শ দিল, কেলেঙ্কারি যা হবার তা তো হয়ে গেছে, এখন ব্যাপারটাকে কোন রকমে চাপা দেওয়া দরকার।

চাপা দেওয়া মানে? গর্জে উঠলেন, জ্যাঠামশাই।

কিছু টাকা-কড়ি দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে নেওয়া—

অসম্ভব! জ্যাঠামশাই চেঁচিয়ে উঠলেন, ছেলে রাস্তায় গিয়ে

বদমাইশি করবে আর আমি বাড়ি থেকে তার খেসারৎ গুনব সে আমাকে দিয়ে হবে না।

জ্যাঠাইমা অন্দরে বসে চোখের জল মুছলেন।

জ্যাঠামশাই অচল-অনড়। তাঁর সেই এক কথা, যে ছেলে গোল্লায় গেছে তার জন্যে পয়সা খরচা করে তাকে প্রশ্রয় দিতে পারব না। অন্যায় করে থাকলে কপালে যা আছে তাই হবে। হতভাগা আসুক একবার বাড়ি থেকে দূর করে তাড়িয়ে দেব।

জ্যাঠাইমা অগত্যা কী আর করেন নিজের সঞ্চয় থেকে টাকা বের করে দিলেন।

নার্সিং হোমের খরচ আর রাজার ভালোবাসার দক্ষিণে হিসেবে বেশ কিছু টাকা দিয়ে রক্ষা করতে হল।

মৃগাঙ্কর মুখ থেকে গল্পটা শুনে ভুরু কোঁচকালো রত্নাবলী।

সত্যি কথা বলতে কী রাজা আসাতে একটু ভয় পেয়ে গেছি।

কেন ?

ভারি ছটফটে ওর স্বভাব। কোন কাজে মন দেওয়া বা কোথাও স্থিতু হয়ে থাকা ওর স্বভাব নয়। দিনরাত্তির কিছু একটা করবার জন্যে ছটফট করে বেড়ায়। অথচ বুঝে উঠতে পারে না কী করবে।

ভাইটি দেখছি দাদার মতো গুণধর। রত্নাবলী হাসল।

ইয়ার্কি করছ ?

ইয়ার্কি কিসের !

না সত্যি, নজর রেখো রাজার উপর। আমি ওকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারি না। তা' ছাড়া ভয়ও করে।

ও কি বাঘ না ভাল্লুক যে ভয় করবে ?

সে সব কিছু নয় বটে, তবু কি রকম যেন মনে হয়, সেদিন দেখলে তো মুরগিগুলোকে কেমন ঘাড় মুচড়ে-মুচড়ে মারল। খিকখিক করে হেসে আমাকে বলল, মেজদা দেখছ মুরগিগুলো অক্কা পাবার আগে ছটফট করছে কেমন করে। দয়া-মায়া ওর শরীরে নেই। ছোটবেলায়

শালিক ধরে মাথা কেটে ফেলত। ওসব দেখে আমি মুখ ফিরিয়ে নিলে অসভ্যের মতো দাঁত বের করে হাসত, মেজদা ভয় পাচ্ছে! মেজদা ভয় পাচ্ছে!

তোমার ভাইটিকে দেখছি না কেন? বারোটা নাগাদ খেয়ে-দেয়ে সেই যে বেরিয়েছে তারপর থেকে পাত্তা নেই। কোথাও পাঠিয়েছ নাকি?

না তো। কোথায় আবার পাঠাব অবাক হল মৃগাঙ্ক।

ঠাকুরপো দু'তিন দিন ধরে তোমার বন্দুক খুঁজছে। পাচ্ছে না। আর আমাকে জিজ্ঞাসা করছে, বৌদি দাদার বন্দুক কোথায় জানো? আমি বললাম, না তো। তা' দেখ বন্দুকটা নিয়ে গেছে কি না কে জানে!

মৃগাঙ্ক শিউরে উঠে বলল, কী সর্বনাশ! বন্দুক দিয়ে সে কী করবে?

বলছিল তো বাঘ-ভাল্লুক শিকার করবে।

ওর কী মাথা খারাপ হয়ে গেছে!

কী জানি!

হঠাৎ মৃগাঙ্ক মাঠের দিকে তাকিয়ে বলল, কাকে যেন বয়ে আনছে দুজন লোক—

ঠাকুরপোকেই তো ধরাধরি করে আনছে বলে মনে হয়!

সেই নাকি! মৃগাঙ্ক দ্রুতপায় নিচে নেমে গেল।

দরজার কাছে এসে রাজসিংহ নিজেই নেমে একপায় দাঁড়ায়। তার প্যান্টের নিচের দিকটা রক্তে ভিজে গেছে। জামাতেও ছোপ-ছাপ রক্তে ভরা!

কী হয়েছে? উৎকণ্ঠিত মৃগাঙ্ক জিজ্ঞাসা করে।

হাতের মুঠো থেকে কী একটা সামনে ফেলে দিল রাজসিংহ, বড্ড বিপদে ফেলেছিল এটা!

ও মাগো! আঁৎকে ওঠে রত্নাবলী!

এটাতো একটা বাচ্চা পাইথনের থেঁতলানো মাথা।

একটু ন্যাকড়া-ট্যাকরা দাও আগে। পটি বেঁধে রক্তটা বন্ধ করি। তারপর বলছি সব। মেজদা এই লোকদুটোকে গোটাদুয়েক টাকা দিয়ে দাও, অনেক তকলিফ্ করেছে আমার জন্যে, বৌদি ডেটল্ থাকে তো এনে দাও, খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে ইজিচেয়ারে এলিয়ে পড়ে রাজসিংহ।

রত্নারলী ছুটে গিয়ে খানিকটা ন্যাকড়া ছিঁড়ে আনে, সঙ্গে ডেটলের বোতল আর তুলো।

মৃগাঙ্ক লোকদুটোকে বিদায় করে দিয়ে ফিরে এলো, একবার ডাক্তার দেখান দরকার, কী জানি বিষাক্ত হয়ে যায় যদি—

অনেক রক্ত বেরিয়ে গেছে আজ ডেটল দিয়ে দেখা যাক তারপর কাল সকালে যাহোক ব্যবস্থা করা যাবে, কি বল বৌদি? রাজসিংহ রত্নাবলীর দিকে তাকাল।

আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

কিছু বুঝতে হবে না বৌদি, শুধু খুবলে নেওয়া জায়গায় খানিকটা ডেটল ফেলে দাও—

ভালো করে পটি বেঁধে মুখটা বিকৃত করে রাজসিংহ বলল, অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে! বৌদি একটু চা-টা দাও, নইলে সামলাতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। মাথাটা আবার ইজিচেয়ারের ওপর এলিয়ে দিল রাজসিংহ।

রত্নাবলী বোধ হয় চা করে আনতে গেল।

মৃগাঙ্ক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছিল তোর?

চোখ বন্ধ করে দাঁতে দাঁত চেপে বসেছিল রাজসিংহ। চোখ খুলে মৃগাঙ্কর দিকে তাকাল, বলছি মেজদা বলছি, আমাকে একটু সুস্থির হতে দাও।

ইতিমধ্যে রত্নাবলী চা করে নিয়ে এল, চা নাও ঠাকুরপো—

চা হাতে নিয়ে তারিয়ে-তারিয়ে খেতে লাগল রাজসিংহ।

মৃগাঙ্ক আর রত্নাবলী তার সামনে উদগ্রীব কৌতুহল নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কুয়াসার মতো আবছা অন্ধকারে রাজসিংহকে দুর্ভেদ্য রহস্যের মতো মনে হয়। তার ধারালো চোখ দুটোতে অবহেলার আলো চকচক করে।

বৌদি। অনেকক্ষণ বাদে মুখ খোলে রাজসিংহ, আজ খুব জোর বেঁচে গেছি। বিষণ্ণ একটা হাসি তার গোঁফ-দাড়িকে ছাড়িয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কি ব্যাপার সেটা বলবে তো ঠাকুরপো ?

ভারি মুসকিলের জায়গা এটা। সকালে-বিকেলে তবু এক-আধটা লোকের মুখ দেখা যায়। সুরু করে রাজসিংহ, বিপদ হয় দুপুরবেলা, কাউকে তখন পাওয়া যায় না। মাঠের লোকজন ঘরে ফিরে যায়। তোমরা ঘুমোও। ভাবলাম, কি করি, চনিলালের ওখানে যাই। গিয়ে দেখি দরজা খোলা, চনিলাল নেই। অতটা পথ গিয়ে রদ্দুরে তখনই ফিরতে ইচ্ছে করল না। ভাবলাম, একটু জিরিয়ে যাই। ঘরে ঢুকে দেখি কলসি-ভরা জল আর চিতা বাঘের চামড়া বিছানো। ভালোই হল, চিতা বাঘের চামড়ার উপর বসে তাকিয়ে চারদিক দেখতে লাগলাম। দেখি, একটা কাঠের পাটাতনে অনেকগুলো বোতল। উঠে গিয়ে একটা বোতল তুলে নিলাম। ভরতি বোতল। মুখটা খুলতেই মহুয়ার গন্ধ এল। একটু জিভে দিলাম, চমৎকার স্বাদ। লোভ সামলাতে পারলাম না। খেতে-খেতে অনেকখানি খেয়ে ফেললাম। তারপর বেরিয়ে পড়লাম। হঠাৎ শরীরটা গরম হয়ে উঠতে লাগল। চোখে যেন কম-কম দেখতে লাগলাম। ঝিমিয়ে পড়া গলার আওয়াজটা একটু তুলে রাজসিংহ বলে যায়, সোজা ফার্ম লক্ষ্য করে হাঁটছিলাম তারপর কী করে পথ ভুল হয়ে গেল। কোনদিকে যাচ্ছিলাম আর কোনদিকে চলে গেলাম !

শেষে যখন খেয়াল হল দেখি পাহাড়ের উপরে গেছি। বুঝলাম,

কিছু একটা গোলমাল ঘটে গেছে। ভয় পেয়ে গেলাম। একটা গাছের তলায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়লাম। মাথাটা বনবন করে ঘুরছিল। গা গুলিয়ে বমি-বমি ভাব শরীরটা আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। কতক্ষণ শুয়ে থাকার পর, মনে হল, পায়ে বুঝি সুড়সুড়ি লাগছে, এক একবার পা সরিয়ে নিতে লাগলাম। এক সময় বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। যখন ঘুম ভাঙল দেখি মাথাটা ছেড়ে গেছে। শরীরটা ঝরঝরে মনে হল। পা টেনে উঠে বসতে গেলাম, ভার-ভার লাগছে। কী ব্যাপার! হাতের উপর ভর রেখে উঠে বসে দেখি, কী যেন একটা পায়ের গোড়ালি কামড়ে ধরেছে। ভালো করে চেয়ে দেখে আঁৎকে উঠলাম। সাপের মতো কী যেন একটা গোড়ালির কাছটা কামড়ে ধরেছে।

তুই জুতো পরে যাস নি?

পরে তো বেরিয়েছিলাম। তারপর চনিলালের বাড়িতে গিয়ে খুলে রাখবার পর আবার পরেছিলাম কিনা মনে নেই। পরে থাকলেও রাস্তায় হয়তো পা থেকে খুলে গেছে।

তারপর? রত্নাবলী।

প্রথমটা আমার অজান্তে গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠলাম ভয়ে। তারপর ছুটে পালাতে গেলাম। তা কখন পারা যায়, আট-দশ সের ওজনের একটা বাচ্চা পাইথন পা কামড়ে ঝুলে আছে। তাকে নিয়ে দৌড়োন কি সোজা ব্যাপার, একটু দৌড়ে মুখ থুবড়ে পড়লাম। চোখ বুজে রইলাম খানিকক্ষণ, ভাবলাম হয়তো পা থেকে ছিটকে গেছে। পা নাড়াচাড়া করতে গিয়ে দেখি, তখনো পা কামড়ে ঝুলে আছে সেই পাহাড়ি চিতি। ভয়ে পাগলের মতো হয়ে গেলাম।

সাহস পাইনা তবু সাপটাকে চেপে ধরে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলাম। মাংসের মধ্যে তার দাঁত বসে গেছে, ছাড়ানো সহজ কথা। তার হিল-হিলে রঙ-বেরঙের চেহারার দিকে চোখ পড়তেই

মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলাম। ভয়টা যেন হৃৎপিণ্ডে বিষাক্ত তীরের মতো বিঁধে অসহ্য যন্ত্রণা দিচ্ছিল।

ভয়টা শেষকালে প্রাণের দায়ে হিংস্র খুনের নেশা হয়ে গেল বড় একটা পাথরের চাঁই তুলে সাপটার শরীরে বারবার আঘাত করে থেঁতলে দিতে লাগলাম। তবু সাপটার চোয়াল আলগা হয় না। শেষকালে দুজন কাঠুরের দেখা পেলাম তাদের একজন কুড়ুলের ঘায়ে শরীর থেকে মাথাটা আলাদা করে দিল। বেশ খানিকটা মাংস গোড়ালি থেকে তুলে নিয়ে গেছে।

কাল একবার রাজনন্দগাঁয়ে গিয়ে ডাক্তারকে দেখিয়ে আসবি।

ইন্‌জেক্‌সন নেওয়া দরকার। সাপের দাঁত তো, বিষিয়ে যেতে পারে। রত্নাবলীও মৃগাঙ্ককে সমর্থন করে।

যাব কি করে অতদূর ? মৃগাঙ্কর মুখের দিকে তাকায় রাজসিংহ।

সে ব্যবস্থা করা যাবে।

ফাল্গুন-চৈত্রের বাতাস ছটফট করে বেড়াচ্ছে। কখনো বাতাসে বনের সুগন্ধ। স্বর্গপুরীর কোন রাজকন্যার আঁচলের মতো এলিয়ে আছে তারাভরা আকাশ।

বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে। আজ রাতে বোধ হয় ঘুম আর আসবে না—

চল, তোকে বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দি।

সেই ভালো। উঠতে চেষ্টা করে রাজসিংহ।

মৃগাঙ্ক তাকে তুলে ধরে ঘরের দিকে নিয়ে যায়।

আজ রাতে কী খাবে ঠাকুর-পো ?

কিছু খাবো না বৌদি। শুধু এক গেলাস জল রেখে যেও টেবিলে।

গোড়ালির যা অবস্থা তাতে বাইরে বেরুবার উপায় নেই। ঘরের মধ্যে ছটফট করে বেড়ায় রাজসিংহ। সকালে উঠে রান্নাঘরে এসে বসে।

রত্নাবলী হেসে বলে, ঠাকুর-পো রান্নাঘরটাকে যে তোমার পার্টনার বানিয়ে ফেললে!

কাচুমাচু মুখে রাজসিংহ বলে, কোথায় যাই বলো দেখি বৌদি?

যাবে আর কোথায়, রান্নাঘরে বসে ঘর-গেরস্থালীর কাজকম্ম কিছু শিখে নাও, কাজে লাগবে পরে—

রাজসিংহ নিঃশব্দে হাসে। উত্তর দেয় না কোন। তারপর বলে, শিখে কিছু লাভ হবে না।

কেন?

ঘর-সংসার করা আমার পোষাবে না।

অমন সবাই বলে থাকে। তারপর একদিন ঝুপ করে বিয়ের পিঁড়িতে বসে পড়ে।

তুমি দেখো। ঠোঁট ওলটায় রাজসিংহ, এই বেশ আছি। আজ এখানে কাল সেখানে এমনি করে দিনগুলো কাটিয়ে দিতে পারলে হয়।

বাব্বা, তুমি যে স্বামীজীদের মতো কথা বলছ—

ও-সব বাজে কথা রাখো. চা-টা দাও এবার। চা খেয়ে ঘুমোই গে—

এই তো একটু আগে ঘুম থেকে উঠলে, এখুনি আবার ঘুমুতে যাবে কী!

কী করব তবে বসে থেকে। এমন জায়গা তোমাদের একটা প্রতিবেশী নেই, শুধু চনিলাল ছাড়া, দেখা হলেই লোকটা শুধু ভালো-ভালো কথা বলে, কান ঝালাপালা হয়ে যায় শুনে—

কী জানি. লোকটা সম্পর্কে আমার এ্যালার্জি আছে। কপালে চন্দন লাগিয়ে যখন মিনমিন করে হাসে তখন একদম সহ্য করতে পারি না—

কীসের লোভে মেজদা রোজ সন্ধ্যেবেলা ওর ডেরায় গিয়ে হাজিরা দেয় বলো দেখি—

কী জানি !

মহুয়ার মধুর জন্যে নয় নিশ্চয়, আরো কিছু রহস্য আছে থাকতে পারে।

তোমার কী মনে হয় ?

আমার আবার কী মনে হবে—

তিন তাসের ব্যাপার-ট্যাপার কিছু—

সে আবার কি ?

আফিমের মতো নেশাধরানো এক রকম তাসের খেলা—

বলতে পারি নে।

আমার কিন্তু তেমনি সন্দেহ হয় বৌদি। ভাবছি, আর একদিন দুপুরবেলায় ব্যাটার ঘরে গিয়ে হাজির হয়ে খুঁজেটুজে দেখব, কিছু পাওয়া যায় কি না। দুপুরবেলা তো বাড়ি থাকে না।

রক্ষে করো ঠাকুরপো। ওসব করবার দরকার নেই।

মেজদা লোকটা একটু বোকা ধরণের হয়তো ঠকিয়ে কিছু রোজগার করে নিচ্ছে চনিলাল—

হতে পারে। তারপর কা ভেবে রত্নাবলী বলে, তেমন কিছু মনে হয় না।

বৌদি, পৃথিবীতে লোক চেনাই সবচেয়ে মুসকিল ! তুমি হয়তো যাকে শুকদেবের বাচ্চা বলে মনে করছ সেই হয়তো পয়লা নম্বর দাগী।

রাজসিংহর মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে রত্নাবলী।

সত্যি বৌদি, এই আমাকে দেখ না, চেনাশোনা সবাই ভাবে রাজা একটা বয়ে যাওয়া নষ্ট ছেলে। লেখাপড়া কিচ্ছু হল না। দিনরাত্তির আড্ডা মেরে বেড়ায়, বাজে ছেলের সঙ্গে মেশে, আসলে সবাই যত খারাপ আমাকে ভাবে, ততোটা খারাপ আমি নই—

কী জানি। একটু উদাস হয়ে বলে রত্নাবলী, তবে চনিলালকে

যা ভাবছ লোকটা হয়তো ততো খারাপ নয়। ঢের পয়সাকড়ি ওর ছিল শুনেছি, সে সব ফেলে এখানে এসে পড়ে রয়েছে—

কেন ?

হয়তো কোন দুঃখ আছে মনে।

ধুর। খানিকটা হাওয়া ছাড়ে রাজসিংহ, লোকটা আমার মতো আকাট। শহরে সুবিধে করতে পারেনি, এখানে এসে ঠেক নিয়েছে। কোন মতলব-টতলব আছে। নানান বুজরুকিতে বিশ্বাস করে। সেদিন তো আমার হাতটা ধরে পেশাদার গণৎকারের মতো অনেকক্ষণ আতস কাঁচ দিয়ে পরখ করে বলল, এতো শেঠের হাত, ব্যবসা করলেই ধূলোমুঠি সোনা হবে।

সত্যি নাকি ? খিলখিল করে হাসে রত্নাবলী, খুব ভালো বেসেছে তো—

ভাবছি ওকে বলব, চনিলালজী বলে দিন তো কোন ব্যবসাটা করলে চট্ করে আমীর হওয়া যায়। তবে হ্যাঁ, লোকটা বেশ মেজাজে গল্প করতে পারে।

চনিলাল আবার কী গল্প করে ?

নানা রকমের গল্প করে। এই তো সেদিন বলছিলাম, চনিলালজী তোমার বন্দুক আছে ?

চনিলাল জিজ্ঞাসা করল, কেন, বন্দুক দিয়ে কী করবে ?

বললাম, চলো না যাই শিকার-টিকার করে আসি—

ভয়ে যেন আঁৎকে উঠল চনিলাল, বলল, ওসব দুষমনি করতে যেও না বাপু।

কেন ?

কী দরকার জানোয়ারদের অভিশাপ কুড়িয়ে, যে যেমন আছে থাকতে দাও। জঙ্গল বড় খারাপ জায়গা। বেড়াতে এসেছ, বেড়িয়ে ভালোয় ভালোয় ফিরে যাও।

বললাম, যাবার আগে একটা বাঘের চামড়া সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারলে কলকাতার লোকদের দেখাতে পারতাম।

ওসব ধান্দা মনেও এনো না বাবু। জঙ্গলে কত রকম আত্মা আছে—

রত্নাবলী চা আর পরোটা সামনে রেখে বলে, তোমার গল্পের ভনিতা শুনেই ভয় ধরে যাচ্ছে—

চায়ে চুমুক দিয়ে রাজসিংহ বলল, জানো বৌদি চনিলাল বলছিল মানুষখেকো বাঘ প্রথমে যাকে মারে সেই মানুষের প্রেতাত্মা নাকি বাঘের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। হি-হি করে হাসে রাজসিংহ।

অমন করে হাসছ কেন? মৃগাঙ্কর চা আর খাবার হাতে তুলে জিজ্ঞাসা করে রত্নাবলী।

আমি অমনি ভূত হলে তোমার ঘাড় মটকাবো প্রথমে—

শিউরে উঠে রত্নাবলী ঘর ছেড়ে খাবার দিতে গেল মৃগাঙ্ককে।

খাণিকক্ষণ পরে ফিরে রত্নাবলী নিজের চা নিয়ে বসল।

তুমি খুব ভয় পেয়ে গেছ বৌদি।

তোমার ওসব গল্প শুনলে কার না ভয় করে।

আরে ধুর চনিলালের গল্প শুনে আবার ভয়, ভূতের খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই বাঘের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াবে।

কী জানি বাবা, রাত হলে জঙ্গলকে বড্ড ভয় পাই। একটু চুপ করে থেকে রত্নাবলী বলে, একটা কথা তোমাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করব ভাবি, ভুলে যাই—

কি কথা বৌদি? অবাক হল রাজসিংহ।

আমাদের বাড়ি তুমি চেন ঠাকুর-পো?

বাঃ তোমার বাড়ি চিনব না কেন। মল্লিকবাড়ি কেনা চেনে, ছেলেবেলায় সুযোগ পেলেই তোমাদের বাড়ির দিকে ছুটতাম, কেন জানো?

মাথা নাড়ে রত্নাবলী।

তোমার ঠাকুর্দা, মানে পাড়ায় যাকে লোকেরা পাখিবাবু বলে জানত। জানালায় জাল দেওয়া ঘরে ঘর-ভর্তি বদরি আর বুলবুলির মধ্যে বসে থাকতেন। হলুদ বদরিগুলো পাখা মেলে তাঁর চকচকে টাকের উপরে কী ধবধবে কাঁধের উপর এসে বসত। ঝোলানো দাঁড়ের উপর বসে একঝাঁক বুলবুলি দোল খাচ্ছে এখনো স্পষ্ট মনে আছে। তোমার দাদু তার ভিতরে বসে আধখানা পান ছিঁড়ে ছিঁড়ে মুখে গুঁজে দিতেন আর খবরের কাগজ পড়তেন। সব সময় টুকটুক করত তাঁর ঠোঁটদুটো, তোমার মনে আছে বৌদি ?

মাথা হেলিয়ে দিয়ে রত্নাবলী জিজ্ঞাসা করল, আমার বাড়ির কোন খবর-টবর রাখো ?

না। মাথা নাড়ে রাজসিংহ, কোন খোঁজ-খবর রাখিনে। তবে খারাপ কোন খবর নেই, তাহলে জানতে পারতাম।

নিশ্চয়ই, তবে তোমরা চলে আসার পর তোমার বাবা দু-বার পুলিশ দিয়ে মেজদার বাড়ী সার্চ করিয়েছিলেন তোমার খোঁজে।

বড্ড রাগী মানুষ। দাঁত দিয়ে নখ কাটতে কাটতে আনমনা হয়ে যায় রত্নাবলী। মায়ের কথা মনে পড়ে। মাকে আজকাল রত্নাবলীর দেখতে বড় ইচ্ছে করে। রাত্তিরে ছাদের উপর মাদুর পেতে বসত মা। পিতলের থালায় একজোড়া বেল কি জুইয়ের মালা থাকত সামনে। দেউড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সাবুগাছের পাতা ঝনঝন করে বাজত বাতাসে। কুচকুচে কালো পদ্মদাসী অন্ধকারে বসে মায়ের পা টিপত। পড়াশুনো শেষ করে রত্নাবলী ছাদে এসে উঠত। পায়ের শব্দে মা বুঝতে পারত রত্নাবলী এসেছে। মা হাত বাড়িয়ে বলত, আয় কাছে এসে বোস। গায়ে হাত বুলিয়ে দিত মা। মায়ের কাছে বসতে রত্নাবলীর কী যে ভাল লাগত ! এখনো রাত হলে ইচ্ছে করে, একবার মায়ের পাশে গিয়ে বসে—মা গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। জীবনের সব বিষ তা হলে অমৃত হয়ে যাবে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রত্নবলী।

কি বৌদি তুমি বাড়ীর কথায় একেবারে অন্যমনস্ক হয়ে গেলে।

নাঃ। হাসল একটু রত্নাবলী, কতদিন বাড়ি ছেড়ে এসেছি তো। মাকে, ছোটভাইটাকে দেখতে বড় ইচ্ছে করে।

তা চল না আমার সঙ্গে কলকাতা ঘুরে আসবে।

সে আর এ জীবনে হবে না।

কেন ?

বিষণ্ণ একটা হাসি রত্নাবলীর ঠোঁট থেকে ফুলের মতো ঝরে গেল।

তবে কী সারাজীবন এ জঙ্গলে কাটাবে নাকি ?

কী জানি।

তোমার বাবার রাগ বোধ হয় পড়ে গেছে, কদ্দিন আর মানুষের রাগ থাকে !

বাবাকে তুমি চেন না।

এতদিনে বোধ হয় তোমার বাবার রাগ জল হয়ে গেছে।

না ঠাকুর পো একদিন স্বেচ্ছায় যা ছেড়ে এসেছি আজ আর তার কাছে গিয়ে দাঁড়াবার কোন অধিকার নেই। যাদের সুখ টেনে ছিঁড়ে ফেলে এসেছি তারাও মন থেকে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে রত্নাবলী উঠে দাঁড়ায়, অনেক বেলা হয়ে গেল তোমার সঙ্গে কথায় কথায়, কত যে কাজ পড়ে আছে !

তোমার এখানে এখনই গরম পড়ে গেল দেখছি !

গরমকালটা এখানে ত্বপুরবেলায় সারা বছরই থাকে।

না বাবা, বড্ড গরম জায়গাটা, আমি আবার গরম একেবারেই সহ্য করতে পারি না।

উঠে পড়ে রত্নাবলী। দেখি তোমার দাদা আবার কী করছে।

কতোদিন বাদে সুস্থ হয়ে উঠল রাজসিংহ।

রত্নাবলী ঠাট্টা করে, তোমার একঠা ফাঁড়া কাটল ঠাকুর-পো।

বাপরে বাপ্! শিউরে ওঠার ভঙ্গি করে রাজসিংহ, ভেবেছিলাম বনের ভিতর থেকে একটা চিতার বাচ্চা ধরে এনে পুষবো।

'রক্ষে কর বাবা। রত্নাবলী যেন ভয় পেয়ে সরে যায়।

না, আপাতত সে ইচ্ছে আর নেই। সাপটা এমন ভয় ধরিয়ে দিয়েছে যে বনের দিকে যেতে সাহস পাই না।

তাই নাকি! খিলখিল করে হাসে রত্নাবলী, এসে তো দিনরাত বন-বাদারে ঘোরা-ফেরা করছো।

বৌদি ওসব বন-জঙ্গলের কথা রাখোতো, তার চেয়ে বল সিনেমায় যাবে, ভালো একটা হিন্দি বই আসছে—

কোথায় গো?

এই যে সেদিন রাজনন্দগাঁও গেছিলাম দেখে এলাম পোষ্টার পড়েছে, এ্যাদ্দিনে বোধ হয় এসে গেছে, যাবে?

কে-কে যাবে?

কেন, দাদা তুমি আর আমি—

তোমার দাদা যাবে সিনেমায় তবেই হয়েছে, তা'হলে ফসল সামলাবে কে?

দাদাকে বলেই দেখ না।

তা' দেখছি। তবে যাবে বলে মনে হয় না। তা' তুমি আজই যাবে নাকি?

চলো না আজই যাওয়া যাক। ফার্মের চৌহদ্দির মধ্যে থেকে-থেকে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। একটু মানুষজনের মুখ না-দেখে আর ভালো লাগছে না। দাদা যদি বাড়ি থাকে তবে তুমি একটু কথা বলে দেখ না বৌদি—

দেখছি। তুমি আছো তো—

আমি এই ফসলের মাঝ দিয়ে একটু ঘুরে বেড়াচ্ছি—

রত্নাবলী একটু পরে ফিরে বলল, না ঠাকুর-পো তোমার দাদাকে রাজি করাতে পারলাম না।

কেন?

বলল, ওসব হিন্দি সিনেমা-টিনেমা আমার ভালো লাগে না। আসলে

ব্যাপার কি জানো, সন্ধেবেলা উনি চনিলালের বাড়ি যাবেন, সেখানে বসে মহুয়ার সরবৎ খাবেন। লোকটাকে আমার দুচক্ষে দেখতে ইচ্ছে করে না।

লোকটা এখানে কী করে বৌদি?

বাগমতীর তীর থেকে বেনগঙ্গা পেরিয়ে নর্মদা পর্যন্ত মাঠে যে সব গরু মোষের দল চরে বেড়ায় তাদের দুধ-ঘি কিনে সহরে চালান দেয়। সকালে উঠে বের হয় সন্ধেবেলা ফেরে।

যাক গে ওসব, এখন বল তুমি যাবে তো?

কিসে করে যাবে?

কেন দাদার জীপে!

তোমার দাদাকে জীপের কথা আমি বলতে পারব না। তুমি বল গিয়ে—

সে আমি ব্যবস্থা করছি। তুমি কিন্তু তৈরি থেকো বৌদি।

সন্ধের আগেই ফিরবে, কথা দিয়ে দুজনেই বেরিয়ে পড়ে।

ষ্টিয়ারিং-এ হাত দিয়ে রাজসিংহ বলে, তোমাদের এমন একটা জীপ আছে অথচ দুজনে বাড়ি বসে কাটাও কি করে ভেবে আশ্চর্য হই।

বেড়ানোর জন্যেই জীপটা কেনা প্রথম-প্রথম দুজনে খুব বেড়িয়েছি। জব্বলপুরে মার্বেল রক দেখতে গেছি জীপে করে খাজুরাহো গেছি একবার। আশে পাশে রাঝেরা-রায়পুর রায়গড়ও ঘুরে এসেছি জীপে করে। আজকাল তোমার দাদা বুড়োদের মতো হয়ে গেছে, সহজে বেরুতে চায় না—

জীপ উড়ে চলল হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

শালের মঞ্জরীর সুবাস হরিণের মতো ছুটে যাচ্ছে।

রত্নাবলীর শাড়ীর আঁচল হাওয়ায় পত্‌ পত্‌ করে উড়ছে। অবিন্যস্ত চুলের রাশ বারবার কপালের উপর এসে পড়ে।

পাহাড়ি পথ এঁকে বেঁকে চলে গেছে পাহাড়ের উপর দিয়ে, দল বেঁধে

দাঁড়িয়ে থাকা গাছের তলা দিয়ে, বয়ে যাওয়া শুকনো পাহাড়ি নদীর খাত পেরিয়ে কতদূর কে জানে!

কিসের নেশা যেন পেয়ে বসেছে রাজসিংহকে, স্পীডোমিটারের কাঁটা সত্তর থেকে আশির মধ্যে ওঠানামা করে।

পাহাড়ের উপর থেকে দেখা যায়, সবুজ ঘাসের ভিতর দিয়ে এলিয়ে রয়েছে কালো এক টুকরো ফিতের মতো পাহাড়ি পথ। তারপরই বাঁক নিয়েছে কেন নিরুদ্দেশের পথে।

বড্ড ভয় করছে ঠাকুর-পো।

কেন?

এত রাফ ড্রাইভ করছ!

গাড়ি কোথায়, এ তো পক্ষীরাজ তোমাকে হাওয়া হয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। হো-হো করে হেসে ওঠে রাজসিংহ।

শোয়ের একটু আগে গিয়ে হাজির হল গাড়ি।

পাশাপাশি বসে সিনেমা দেখল দুজনে। রত্নাবলী হঠাৎ যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। তার বুকের তলায় জমে থাকা কিছু খেদ কারণে অকারণে চঞ্চল করে তুলল রাজসিংহকে। শিকারি চিতার মতো ধূর্ত একটা চাউনি দু'একবার তার চোখে হানা দিয়ে গেল।

ফিরতে হল রাত। অনেকদিন বাদে রত্নাবলী সাধ মিটিয়ে চপ্-কাটলেটের ঘাড় মটকালো।

ফার্মের দিকে যখন গাড়ির মুখ ঘুরল তখন সন্ধে কখন পেরিয়ে গেছে।

বড্ড রাত হয়ে গেল ঠাকুর-পো।

তা' একটু হয়ে গেছে। রেষ্টুরেণ্টে গিয়ে না বসলে সন্ধে-সন্ধে পৌঁছে যেতে পারতাম। তবু চলো দেখি কতোটা তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেওয়া যায়। গাড়িতে বসে ষ্টার্ট দিল রাজসিংহ।

রাজনন্দগাঁ ছাড়িয়েই জঙ্গল চলে গেছে অনেক দূর অবধি। সেই জঙ্গলের ভিতর পথ ঘাপটি মেরে আছে। আলো পড়তে চমকে উঠছে।

পাহাড়ি পথ এঁকে বেঁকে নিজের খেয়াল মতো চলেছে। তার সঙ্গে পাল্লা রেখে জীপের কালঘাম ছুটে যাচ্ছে।

একটু পরে রাজসিংহ বলল, যেতে যতো দেরি হয় ততোই ভালো বৌদি! গিয়ে তো সেই ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকা—

দেরি হলে তোমার দাদা ভারি ব্যস্ত হয়ে উঠবে। ওর মনটা চনিলালের বাড়িতে যাবার জন্যে ছটফট করবে। যেতে না পারলে ভারি কষ্ট হবে—

জনমানুষের বসতি নেই এমন জঙ্গলে তুমি কী করে যে থাক বৌদি ভাবতে আমার অবাক লাগে. সিনেমা নেই। বন্ধু নেই! বেড়ানো নেই!

অভ্যেস হয়ে গেছে ঠাকুরপো।

কী করে করলে?

অবস্থার সঙ্গে মানুষকে মানিয়ে নিতে হয়।

সবটা কি মানিয়ে নিতে পেরেছে?

গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল গাড়ি। পথ ক্রমশ উঁচু পাহাড়ের উপর দিয়ে গড়িয়ে নিচে নেমে গেছে। একপাশে নিবিড় জঙ্গল, অন্যদিকে গভীর খাত। গাড়ি বুনো শুয়োরের মতো গক্-গক্ করে ছুটে আসছিল এতক্ষণ, এবার পাহাড়ের ওপরে উঠতে হিমসিম্ খেয়ে গেল যেন। পাহাড়ের ওপর উঠে পথ একটুখানি সোজা গিয়ে বেঁকে গেছে। গাড়ি সেই বাঁকের মুখে হোঁচট খেতে খেতে থেমে গেল। হাত পনেরো বিশ দূরে জঙ্গলের রাজা থাবার উপর ভর দিয়ে বসে আছে। চোখে আলো পড়তে তার নীলচে-হলুদ চোখ চক্‌চক্ করে উঠল! অস্ফুট বিরক্তি, ভারি একটা ঘড়ঘড়ে শব্দ হয়ে বেরিয়ে এল।

গাড়ির দম বন্ধ হয়ে গেল। দুর্বোধ্য একটা শব্দ করে থেমে গেল গাড়ি। হেডলাইটের আলোর পরিসরে সেই বিশাল আকৃতির জানোয়ার সম্পূর্ণ ধরা পড়েছে। পথের এমন জায়গায় বসেছে যে তাকে এড়িয়ে যাবার কোন উপায় নেই।

সেই নিঃসাড় বনভূমিতে একমাত্র ঝিঁঝিঁর শব্দ ছাড়া আর সব শব্দ ফেরার।

ক্রুর কুটিল হিংসার মুখোমুখি বসে রত্নাবলী হঠাৎ যেন কেমন বিহ্বল হয়ে গেল। উঃ মাগো, বলে রাজসিংহের গায়ের উপর ঢলে পড়ল।

স্টিয়ারিং ধরে সোজা হয়েই বসেছিল রাজসিংহ। ইতিমধ্যে দু'একবার হর্ণও বাজিয়েছিল। তাতে কোন কাজ হয় নি। বাঘ অলসভাবে হাই তুলেছে তার বেশি কিছু নয়। সরে যাবার কোন ইচ্ছে দেখায় নি।

রত্নাবলী রাজসিংহের গায় ঢলে পড়ার পর তার শরীরটা যেন পেট্রোলের মত দপ করে জ্বলে উঠল। হিংস্র বাঘটাই বুঝি লাফ দিয়ে তার শরীরের ভিতর ঢুকে গেল। আর রাজসিংহ সেই মুহূর্তে সতর্ক একটা নরখাদক হয়ে উঠল। ইচ্ছে করছিল, ধারালো দাঁত দিয়ে রত্নাবলীর নরম মাংস ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খায়।

রত্নাবলীর মুখের ওপর রাজসিংহের মুখটা ঝুঁকে পড়ল। ক্ষুধার্ত চোখ দিয়ে বাঘ যেমন তার শিকারের লাশের ওপর থাবা পেতে বসে তেমনি মনে হচ্ছিল নিজেকে রাজসিংহর।

প্রহর কখনো অলস-মন্থর। কখনো তুরন্ত।

চোখ মেলে চমকে উঠে বসে রত্নাবলী। তার চোখের গভীরে একটা শঙ্কা ছটফট করে। নড়েচড়ে সরে বসে রাজসিংহ, খুব ভয় পেয়ে গেছিলে তুমি বৌদি!

বাঘটা চলে গেছে?

এইমাত্তর খাদের দিকে নেমে গেল। গাড়িতে স্টার্ট দিল রাজসিংহ।

বড্ড ভয় পেয়ে গেছিলাম।

দেখছি। রাজসিংহ ঠোঁট চেপে হাসল।

সন্ধের বেশ একটু পরেই গাড়ি এসে ফার্মের গেটের ভিতর ঢুকল।

বাড়িটা অন্ধকার।

দাদা বোধ হয় বাড়ি নেই। রাজসিংহ ফিসফিস করল।

উত্তর না দিয়ে রত্নাবলী ভিতরে ঢুকে গেল। অকারণ একটা আশঙ্কা তার মনের মধ্যে নড়েচড়ে উঠল। বন-জঙ্গল, বিদেশ-বিভুঁই, আর যা ভোলা মানুষ একলা রেখে যাওয়া ঠিক হয় নি। কিংবা হয়তো তাদের দেরি দেখে চনিল্যালের বাড়ি চলে গেছে।

গাড়িটাকে ছাউনির মধ্যে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে রাজসিংহ ফিরল। তার মনে হচ্ছিল, মাছ যেমন করে হাত পিছলে জলের গভীরে ডুব দেয়, আজকের সুযোগটাও তেমনি করে পিছলে গেল। মন তাকে ধমক দিতে লাগল, এত ভয় পাবার কি হয়েছিল, এমনও তো হতে পারে তাকে সুযোগ করে দেবার জন্যে তার গায়ের উপর অমনি করে এলিয়ে গেছিল বৌদি। নিজের আহাম্মুকিকে ধিক্কার দিতে-দিতে বাড়ির দিকে এগোতে থাকে রাজসিংহ।

রত্নাবলী তাড়াতাড়ি আলো জ্বেলে খোলা ঘরগুলো খুঁজতে থাকে। না, ইজিচেয়ারে নেই। জানালায়ও নেই। তবু নিজের ঘরে গিয়ে দেখে, আশ্চর্য কাণ্ড, মৃগাঙ্ক ভর-সন্ধেটা ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। এখনো কাটাচ্ছে।

এই সন্ধেবেলা দরজা খুলে তুমি ঘুমোচ্ছ, একটা বাঘ-টাঘ ঢুকে পড়তে পারত, কি যে সব কাণ্ড-কারখানা কর আজকাল!

তাই নাকি! ঘুম থেকে উঠে বসে মৃগাঙ্ক বলে, এমন বাজে স্বপ্ন দেখছিলাম, তোমাকে বাঘে ধরেছে!

যাঃ! চমকে ওঠে রত্নাবলী।

সত্যি গো সত্যি। স্বপ্ন সত্যি হয় না তাই রক্ষে, না হলে কী কাণ্ড যে হত কে জানে হাই তোলে মৃগাঙ্ক, এখন চা-টা দাও, চনিলালের ওখানে যেতে হবে।

দাঁড়াও কাপড়টা ছেড়ে একটু বসি।

রাজা কোথায় গেল?

গাড়িটা তুলে দিয়ে আসছে বোধ হয়। পর্দা তুলে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো রত্নাবলী। যে কথাটা এতক্ষণ মনের গভীরে থেকে লজ্জা

দিচ্ছিল সবার আড়ালে অন্ধকারে বুকের ভিতর তাই নড়ে চড়ে উঠল। এতদিন জঙ্গলে সে আছে সত্যি কিন্তু এমন অবস্থায় কোনদিন বাঘের মুখোমুখি হয় নি। সেই রাজকীয় সংস্রবের বিহ্বলতা তাকে কেমন যেন নিথর করে দিয়েছিল। কয়েক মুহূর্তের জন্যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল হয়তো। অমনি করে রাজসিংহের গায়ের উপর পড়া তার উচিত হয় নি। সামলে নিতে পারলে ভালো হত। রত্নাবলী যখন চোখ মেলল দেখে রাজসিংহর মুখটা তার মুখের উপর ঝুঁকে আছে। মুখের একেবারে কাছাকাছি। কী দেখছিল সেই জানে! কতক্ষণ অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল রত্নাবলী।

মৃগাঙ্কর গলা শোনা গেল, চা হয়েছে?

নিজের ভাবনাকে অন্ধকারে লুকিয়ে রেখে সাড়া দিল, এই যে দিচ্ছি।

রাত এখন ক'টা হবে কে জানে। জল খেতে উঠেছিল রত্নাবলী। উঠে অবাক হয়ে গেল। পৃথিবী জোছনায় ভরে উঠেছে। কে যেন হাত ধরে জানলার কাছে টেনে নিয়ে গেল। ফার্মের বাইরে একদল চিতল হরিণ এসেছে ফসলের লোভে। মাঝে মাঝে গলা বাড়িয়ে ফসলে মুখ দিতে চেষ্টা করছে।

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রত্নাবলী। শিশির-গলা জোছনায় পৃথিবীর মুখ যেন পালটে গেছে। বুকের ভিতর যে-সব বেদনা স্মৃতি হয়ে থাকে তারা যেন সব দল বেঁধে বাইরে আসতে চায়! ছোটবেলার দিনগুলো মনে পড়ে। যাদের ছেড়ে এসেছে তারা সবাই যেন দল বেঁধে সামনে এসে দাঁড়ায়। অতীতের ছোটখাটো সুখ-দুঃখ, তুচ্ছ স্মৃতি-বিস্মৃতি এই জোছনায় মনের মধ্যে অসীম এক বেদনার ছায়া হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

শেষ রাতের জোছনায় জেগে উঠে পৃথিবীকে ভালো লাগে না। নিজেকেও ভালো লাগে না। প্রতিদিনকার পরিচিত ব্যবহৃত সব কিছু যেন বিস্বাদ হয়ে যায়। হাত বাড়িয়ে ছুঁতে ইচ্ছে করে সেইসব দিন যা

সে ফেলে এসেছে। আর যা সে কখনো পায় নি। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রত্নাবলী।

কাল সকালে মৃগাঙ্ককে একবার বলবে, ওগো চলো না একবার কলকাতা যাই। এখানে কী করে একটা মেয়ের দিন কাটে বোঝ না। তুমি সারাদিন তোমার জমি আর ফসল নিয়ে থাক। সন্ধেবেলা চা খেয়ে চনিলালের ওখানে গিয়ে বস। রাত্রে বাড়ি ফিরে নাক ডাকিয়ে ঘুম দাও, দিনে কথা বলার লোক পাই না। রাত্রে ঘুম আসে না। আর আমার ভাণ্ডারার এই মাঠ-প্রান্তর ভালো লাগছে না।

এই জোছনার মধ্যে কোথা থেকে বাতাসে বেহালার সুর ভেসে আসছে।

রত্নাবলী জানে, চনিলাল বেহালা বাজাচ্ছে। রাত যখন গভীর হয়, পৃথিবীতে কেউ বুঝি জেগে থাকে না তখনই চনিলালের বেহালার সুর ছড়িয়ে পড়ে। যে বেদনা মানুষের ভাষায় প্রকাশ পায় না সেই বেদনা বেহালার সুরে ছড়িয়ে দেয়।

বেচারা! মনে মনে ভাবে রত্নাবলী, সব থেকেও পৃথিবীতে কিছু নেই। মৃগাঙ্কর কাছ থেকেই শোনা, চনিলালের বৌ আছে। এখন আর তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। বাড়ি-ঘর সব ছেড়ে এসেছে চনিলাল। তারপর থেকে এই মাঠের মধ্যে ডেরা বেঁধে আছে। মৃগাঙ্ক আসবার আগে তো একলাই থাকতে হত। পয়সাকড়ির অভাব ছিল না চনিলালের, বাপ-ঠাকুর্দা গোল্লায় যাবার মতো যথেষ্ট টাকা রেখে গেছিল। সুন্দরী একটি বৌও তাদের বংশধরের জন্যে জোগাড় দিয়ে যেতে তারা ভোলে নি। পয়সার অভাব না-থাকলে যেমন হয় তেমনি অনাবিল সুখে-স্বাচ্ছন্দে বয়ে যাচ্ছিল দিন।

বৌয়ের কী সখ হল, তীর্থ-ধর্ম করতে বের হবে। চনিলালে বলল, বেশ তো, তোমার যখন ইচ্ছে হয়েছে চলো যাওয়া যাক। লটবহর বেঁধে বেরিয়ে পড়ল তারা। পথের মাঝখানেই এক ছোকড়ার সঙ্গে আলাপ হল, সেও তীর্থ করতে বেরিয়েছে। বয়েস চনিলালের মতোই কি তার

থেকে একটু বেশি হবে। তার কোন সঙ্গী নেই। চনিলাল বেচারা কোনদিন বাড়ির বাইরে পা দেয় নি। স্বভাবতই পথ তার মনে নানা ত্রাস ও আশঙ্কার সৃষ্টি করেছিল। পথের মধ্যে বন্ধু পেয়ে চনিলাল বর্তে গেল। নতুন পরিচিত বন্ধুটিও চনিলাল ও তার বৌকে, ভাইয়াজী ও বহেনজী বলে অস্থির করে তুলল। তাদের উপর সজাগ সতর্ক চোখ রেখে সব তকলিফ আসান করে দিতে লাগল। তারই সাহায্যে স্বামী-স্ত্রী কেদারবদরী করে এল। বিদায় নেবার সময় স্বামী-স্ত্রী দুজনে বারবার পথের বন্ধুকে তাদের বাড়িতে যেতে নেমতন্ন করল। তাদের আগ্রহে অবশেষে বন্ধুটি রাজি হল। সুরু হল তার আসা-যাওয়া। বন্ধুকে অশেষ বিশ্বাস করেছিল চনিলাল। মেয়েদের মনোহরণের কৌশল এই মানুষটির ভালো জানা ছিল। একটু একটু করে সাপেদের ডাইনি অজগরের মতো চনিলালের বৌকে মোহের মাথায় বেঁধে ফেলল। ব্যাপারটা এক-আধটু চোখে পড়লেও প্রথমদিকে আমল দিতে চায় নি চনিলাল। ছোট বয়েস থেকে তো বৌকে দেখে আসছে, তার দ্বারা কোন অন্যায় সম্ভব একথা সে কিছুতে ভাবতে পারত না।

প্রথমবার খাবারে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হল। খাবার মুখে দিয়ে বিস্বাদ লাগতে চনিলাল আর খায় নি। সে যাত্রা বেঁচে গেল তাই। তারপর চনিলালের বৌ নিজের হাতে সরবতে বিষ মিশিয়ে তাকে খাওয়ায়। মরেই যেত সে যদি না ঘটনাচক্রে তার পরিচিত একজন সেখানে এসে হাজির হয়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে বাঁচিয়ে তোলে।

এর অব্যবহিত পরে বন্ধুটি এসে হাজির। চনিলালের বিপদের কথা শুনে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠল। আসলে আর আসবার উদ্দেশ্য ছিল, চনিলালের লাশটা তাড়াতাড়ি নিয়ে পোড়ানোর ব্যবস্থা করা যাতে কেউ বুঝতে না পারে।

চনিলাল সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে বন্ধুটিকে আটকালো। তারপর পাড়া-প্রতিবেশীদের ডেকে আদ্যন্ত ঘটনা জানালো। সবাই বলল, পুলিশে খবর দাও। চনিলাল বলল, না। বৌকে সে ভালোবাসত খুব।

সে বলল, আমার দোস্তের সঙ্গে বৌয়ের সাদি দিতে চাই। কেননা আমাকে সরিয়ে ওরা দুজন দুজনকে পেতে চেয়েছিল। ওদের ইচ্ছা পূর্ণ করে দিতে চাই। চনিলাল দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দিয়ে বন্ধুর সঙ্গে বৌকে বাড়ি থেকে বের করে দিল।

কয়েক বছর বাদে বৌ ফিরে এস। বন্ধুটি তাকে পথে বসিয়ে গহনাগাঁটি সব নিয়ে একেবারে বে-পাত্তা। বৌ তার ভুল বুঝেছে। অনুশোচনার আত্মগ্লানিতে সে দগ্ধ। তাকে আশ্রয় দেওয়া হোক। মাটিকে আছড়ে পড়ে চোখের জলে চনিলালের গা ভিজিয়ে দিল। তখনো চনিলালের ভালোবাসা মরে নি। বৌকে ঠেলে সরিয়ে দিতে পারল না। বাড়িটা তাকে দিয়ে নিরুদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল। তারপর ভাণ্ডারা জেলার এই মাঠে এসে ঠেকেছে। এখানে স্থায়ী বসতি করেছে। এখানেই মরবার আশা। ঘর-সংসার তার কাছে বিস্বাদ হয়ে গেছে।

পুরোনো সেই ভালোবাসা রাত-বিরেতে মাথা তুলে বুকের ভিতর আঁচড়ায়-কামড়ায়। বাড়ি থেকে বেহালাটা সঙ্গে করে এনেছিল চনিলাল, কখনো সেটা হাতে তুলে নেয়। ছড়ের দু'একটা টান দেয়। নিশুত-নির্জন বন-পাহাড় মাঠ সেই বাজনা শুনে জেগে ওঠে। সবটা তার শোনা যায় না। কান্নার মতো গুমরে-গুমরে বাজে। অস্ফুট দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতো খানিকটা কানে আসে।

সেই বাজনার সুর ভেসে আসছে।

হরিণগুলো বেড়া ভেঙে ফেলবে না কি জানালা ধরে জোছনায় নকসা করা মাঠের রূপকথার দিকে চেয়ে থাকে রত্নাবলী।

বৌদি! কাঁধে হাত রেখে রাজসিংহ বলে, তুমি ঘুমোও নি?

না।

কি করছ এখানে দাঁড়িয়ে?

এমনি দাঁড়িয়ে আছি। তুমি তো আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে। ভূত-টুত ভেবেছিলে বোধ হয়।

ভাবলে আর দোষটা কিসের। ভূত ছাড়া মানুষ এত রাতে জেগে থাকবে কিসের জন্যে—।

হেসে ওঠে রাজসিংহ, আমরা দুজনেই তা' হলে মানুষ নই।

তাই হবে বোধ হয়।

দাদা ঘুমুচ্ছে নাকি ?

তোমার দাদার রাত্রে আর কোন কাজ আছে বলে তো জানি না।

এমন জোছনা রাতে আমার কিন্তু ঘুমতে ইচ্ছে করে না।

কেন, তোমার আবার কি হয় ঠাকুর-পো ?

অদ্ভুত সব ভাবনা মনে আসে, শুনলে হয়তো তোমার হাসি আসবে।

তা হলে আর শুনে কাজ নেই। ঘরের দিকে মুখ ফেরায় রত্নাবলী।

তোমার শুনতে ইচ্ছে করে না বৌদি ?

রত্নাবলী উত্তর না দিয়ে তাকাল রাজসিংহের দিকে। চোখে তার রহস্যময় জিজ্ঞাসা চকচক করে।

রত্নাবলীর দিকে খেয়াল ছিল না রাজসিংহর। সে বলে যায়, তোমার হয়তো শোনার ইচ্ছে নেই কিংবা আছে, কে জানে। আমার কিন্তু তোমাকে শোনাতে খুউব ইচ্ছে করছে। ছোট ছেলেদের মতো মাথা হেলিয়ে বলে, বলি বৌদি ? রত্নাবলীর সম্মতির অপেক্ষা না-করেই রাজসিংহ বলে, এই জোছনার মাঠে তোমার কোলে মাথা রেখে শুতে ইচ্ছে করে, ইচ্ছে করে ছেলেবেলার গল্প শুনি।

রত্নাবলীর চোখ দুটো হঠাৎ বুঝি জ্বলে উঠে স্বাভাবিক হয়ে এল। অস্ফুট স্বরে বলল, জানা রইল। তারপর সোজা ঘরে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে বিছানার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। জোছনায় প্রৌঢ় হয়ে আসা মৃগাঙ্কর মুখটা ভিজে জবজবে হয়ে আছে। তাকে ম্যমীর মতো দেখায়।

এই, ওঠো, ওঠো। হিংস্র হাত বাড়িয়ে মৃগাঙ্ককে নাড়া দিল রত্নাবলী বিছানার উপর বসে, এই শুনছ, ওঠো! কী ঘুম রে বাবা—

এ্যাঁ! বিছানার উপর ধড়মড় করে উঠে বসে মৃগাঙ্ক, কি বলছ ?

মনে হল চোর ঢুকেছে—

কী বলছ?

সত্যি, তাই যেন মনে হল, রত্নাবলী বুঝি নিজের মনে কথা বলে।

পাগল, চোর এখানে আসবে কী জন্যে, কি আছে এখানে নেবার! ফসল-টসল উঠলে তবু না হয় কথা ছিল। আমার মনে হয় তুমি বোধ হয় স্বপ্ন দেখছিলে—

তাই হবে বোধ হয়। ছেড়ে ছেড়ে শব্দগুলো উচ্চারণ করে রত্নাবলী। তারপর উঠে গিয়ে ঢকঢক করে খানিক জল খেয়ে ফিরে এসে ধপাস করে বিছানায় শুয়ে পড়ে বলল, রাত্তিরে যেমন ঘুমোও তুমি, কোনদিন চোরে যদি আমাকে চুরি করে নিয়ে যায় তো জানতেও পারবে না!

বিহ্বল মৃগাঙ্ক আলুলায়িত চুলে ছাওয়া রত্নাবলীর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকায়। তারপর রত্নাবলীর পাশেই ঝুপ করে শুয়ে পড়ে।

দরজার বাইরে কান পেতে দাঁড়িয়েছিল রাজসিংহ। দাদা বৌদির কথা শুনে হাসি পাচ্ছিল তার। বৌদি তাকে চোর ঠাউরেছে। সত্যি তো সে চোর ছাড়া আর কী, অধিকার নেই এমন নিষিদ্ধ জিনিসে হাত বাড়ানো চুরি ছাড়া কী!

একটা শিসের শব্দ ছুটে এসে রত্নাবলীর কানে বিঁধল।

চমকে উঠে চারদিকটা একবার দেখে নিল তারপর ভয় পেয়ে জল থেকে উঠতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। এই তো একটু আগে হলুদ শাড়ি, সায়া আর ব্লাউজ পাড়ের উপর রেখে শুধু ব্রেসিয়ার পরে জলে নেমে এসেছে। কী জানি কেউ এসে যদি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে। জল থেকে উঠে গিয়ে কাপড় পরবার ইচ্ছেটা কোন রকমে সামলে রাখে রত্নাবলী। বুকের ভিতরটা ভয় পাওয়া পাখির মতো ধুক ধুক করে। টলটলে জলের চারদিকে তাকিয়ে কারো হদিশ পায় না।

নিঃসাড় নিঝুম বিকেল। হয়তো বিকেল ঠিক নয়। রোদে এখনও তেজ আছে। আকেলির ঝোপ-ঝাড়ে খয়েরি নীল চুনিয়া পাখি

কিচির মিচির করছে ! আর ঝিরঝিরাইয়ার জলের ঝির ঝির করে পড়া শব্দের ছায়া গানের সুরের মতো বেজে চলেছে।

ঠাকুরাণী পাহাড়ের গা চুঁইয়ে ঝিরঝিরাইয়ার যে জলের ধারা নেমেছে রেচানার গাছের তলায় একটা পাহাড়ের ফাটলে তা জমে থাকে। গরমের সময়ও শুকোয় না।

ভাণ্ডারা জেলার এই মাঠে আসবার অনেকদিন পরে মৃগাঙ্ক আর রত্নাবলী ঝিরঝিরাইয়াকে খুঁজে পায়।

রত্নাবলীদের বাড়ি থেকে কতটা আর দূর এই ঠাকুরাণী পাহাড়। সকালে ঘুম থেকে উঠে বাইরের দিকে তাকালেই মুখোমুখি দেখা। দেখা হলেই যেন হাতছানি দিয়ে ডাক দেয়। গাছপালা গজিয়ে সবুজ হয়ে থাকা যমজ ভাইয়ের মতো দু' তিনশ ফুট উঁচু একজোড়া পাহাড়। মাঝখানে উপত্যকার মতো একটা এলাকা। জংলি হর্তুকি, অর্জুন আর শাল-সেগুনে ভরা। মাঝে মাঝে ধুতরোর ঝোপ। তার মাঝ দিয়ে পায়ে চলা সরু একটা পথ চলে গেছে। ঝিরঝিরাইয়ার জলের ধারা উপত্যকার উপর দিয়ে বয়ে এসে নিচে গড়িয়ে পড়েছে।

রত্নাবলী একদিন বলল, এই—

কি। সাড়া দিল মৃগাঙ্ক।

চলো না একদিন ঘুরে আসি ঠাকুরাণী পাহাড় থেকে—

বেশ তো কবে যাবে বল ?

আজই চলো না।

সেই দিনই দুপুরের একটু পরে রত্নাবলীকে সঙ্গে নিয়ে মৃগাঙ্ক বেরিয়ে পড়ল। কাঁধে বন্দুক ঝোলানো। হাতে ফ্লাস্ক ভরতি চা।

ওমা সঙ্গে আবার বন্দুক নিচ্ছ কেন ?

কি জানি বলা তো যায় না। পথে যদি কোন জানোয়ারের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

একঝাঁক পীলা চিড়িয়ার মতো হাসি বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে রত্নাবলী বলে, তুমি বড্ড ভীতু !

তাতো এখন বলবেই। মৃগাঙ্কর চোখে কৌতুক চিকচিক করে, না হলে এই বুড়ো বয়সে তোমার সঙ্গে ঝুলে পড়ি।

ওর এটাতো ভারি একটা ইয়ে। ঠোঁট উলটে রত্নাবলী মুখ ফেরায়।

ঠাকুরাণী পাহাড়ের উপত্যকায় সেদিন দুজনে খুব ঘুরেছিল। বারবার ঝোপে-ঝাড়ে রত্নাবলীর কাপড় আটকে ভয় পাচ্ছিল বেচারা। আর মৃগাঙ্ক তাকে সাহস যোগাচ্ছিল। সব দেখে শুনে ফিরতে দেরি হয়ে গেছিল। তাড়া দিল মৃগাঙ্ক, সন্ধ্যে আসবার আগে নেমে যেতে হবে।

তাড়াতাড়ি নামছিল দুজনে। আগে মৃগাঙ্ক পিছনে রত্নাবলী। আধাআধি নেমে আসবার পথের মাঝখানে কী একটা জন্তুকে দেখা গেল। পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। গাছপালার আড়ালে স্বচ্ছ একটু অন্ধকারে তার চোখদুটো চকচক করছিল। ওদের দেখে বোধ হয় অবাক হয়ে গেছিল।

মৃগাঙ্ক হাতটা পিছনের দিকে এগিয়ে থামতে ইশারা করল রত্নাবলীকে।

কি গো? জিজ্ঞাসা করল রত্নাবলী।

চিতাবাঘ বলে মনে হচ্ছে। মৃগাঙ্কর গলা কাঁপছিল।

মৃগাঙ্কর পিঠের উপর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল রত্নাবলী, কৈ দেখি—

আঃ। দাঁতে দাঁত চেপে মুখটাকে হিংস্র করে তুলল মৃগাঙ্ক। এই সময় পিঠের উপর ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়লে, এখন বন্দুক তুলে পজিশন নেব কী করে? এর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে যদি আমাদের উপর! বলে কনুইয়ের এক গুঁতোয় রত্নাবলীকে সরিয়ে দিয়ে বন্দুক তুলে দাঁড়াতেই জন্তুটা জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এক লাফ দিয়ে সামনের পথ দিয়ে নিচে নেমে গেল।

ওমা এতো লোমরি, বেচারা ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল—

বিরক্ত হয়ে মৃগাঙ্ক বলল, লোমরি আবার কী? এখানকার লোকেরা চিতাবাঘকে লোমরি বলে নাকি?

হেসে উঠে রত্নাবলী বলল, না-গো-না শেয়ালকে বলে।

কে বলল শেয়াল?

আমার নিজের চোখে দেখলাম যে—

ঘোড়ার ডিম দেখেছ, এখন তাড়াতাড়ি করে করে নামো, সন্ধ্যে হয়ে গেলে মুশকিলে পড়ে যেতে হবে। একটু থেমে নিজের মনে গজগজ করে মৃগাঙ্ক, এই জন্যে শাস্ত্রে বলেছে, পথি নারী বিবর্জ্জিতা।

সে রাত্রে আর রত্নাবলীর সঙ্গে কথা বলেনি মৃগাঙ্ক। তারপর কতদিন দুজনে তর্ক হয়েছে, শেয়ালটা মৃগাঙ্কর কাছে চিরকাল চিতাবাঘ হয়েই রইল। বেচারার ভাগ্য।

আবার একটা শিস ভেসে এল।

এবার রত্নাবলী সত্যি ভয় পেয়ে গেল। কে জানে হয়তো কোন বাজে প্রকৃতির লোক গাছপালার আড়াল থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে। জলের মধ্যে শরীরের সবটুকু আড়াল করে ঠোঁট কামড়ে ধরে রত্নাবলী।

কী মুসকিল এই অবস্থায় জলের উপরে যে উঠবে সেটাও সম্ভব নয়।

দিনের আলো ক্রমশ মরে আসছে। আর খানিকক্ষণ বাদেই অন্ধকার নেমে আসবে। তখন তৃষ্ণার্ত কোন জানোয়ারের এদিকে এসে পড়াও বিচিত্র নয়।

কান্‌হার মাকেই নিয়ে আসছিল ক'দিন। ফার্ম হাউসের জলে স্নান করে আশ মেটে না। তাই মাঝে-মাঝে আসে। আজ এসে তো বড্ড বিপদে পড়ে গেল!

জলের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রত্নাবলী। রেচানার গাছের সাদা ফুল টুপটাপ করে জলের উপর ঝরে পড়ে।

আবার একটা শিসের শব্দ গাছপালার ফাঁক দিয়ে ছুটে এল।

শব্দটা যে কোন মানুষের ঠোঁট থেকে আসছে এ বিষয়ে সন্দেহ

নেই। জানতে পারলে মৃগাঙ্ক বড্ড রাগারাগি করবে। সে তো বলেই দিয়েছে। কোনদিন একলা ঝিরঝিরাইয়ার জলে নামতে যাবে না। বলা যায় না বিদেশ-বিভুঁই। তাছাড়া কোন জানোয়ার জল খেতে এসে পড়তে পারে।

কান্‌হার মায়ের জন্যে দেরি তো করেছিল রত্নাবলী! তা' সে বুড়ির আসতে সন্ধ্যে নেমে যায় কোন-কোন দিন।

বিকেলের দিকে বেরিয়ে রাজসিংহ ঘুরতে-ঘুরতে ঠাকুরাণী পাহাড়ের কাছাকাছি এসে পড়েছিল। মাঠ-ভরা অলৌকিক রোদে গাছপালা যেন আলোর সামনে ধরা ফিল্‌মের নেগেটিভের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ কানে গানের গুনগুনানি ভেসে এল। অবাক হল রাজসিংহ। চারদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। মনে হল সুরটা ঝিরঝিরাইয়ার ওদিক থেকেই আসছে। কৌতূহল তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল। চিতাবাঘের মতো সন্তর্পণে ঝোপঝাড় এড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখে, রত্নাবলী জলে নেমেছে। নিটোল জলে যেন পরীদের কেউ নাইতে নেমেছে বুঝি। পাড়ের উপর এলোমেলো কাপড়-চোপড় পড়ে রয়েছে। অনাবৃত অবয়বের লাবণ্যে চোখ পড়ে ঠিকরে আসে!

ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে রাজসিংহ। ইচ্ছে করে জলের মধ্যে লাফ দিয়ে পড়ে। কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে শিস দিল। আর চমকে উঠে ভয়-পাওয়া চোখ মেলে তাকাল রত্নাবলী। জল ছেড়ে পাড়ের উপর যে উঠবে তার উপায়ও নেই।

মাঝে-মাঝে শিস দিয়ে রাজসিংহ রত্নাবলীকে চমকে দিতে থাকে। আর দুর্বোধ্য এক অভিলাষ তার মনের মধ্যে হেসে কুটিপাটি হয়। যেমন করে শ্বাপদ জঙ্গলের আড়াল থেকে শিকারের উপর নিরিখ করে তেমনি অস্তিত্ব গোপন রেখে রাজসিংহ অর্ধেক রহস্য আর অর্ধেক কল্পনা রত্নাবলীকে দেখে কামনার আর্ত জিভ চাটে।

রাজসিংহের মনের মধ্যে উত্তেজনা কখনো দুরন্ত হয়ে ওঠে।

রত্নাবলীর শরীরেও যে রহস্য প্রিন্টেড্ ভয়েলের নিচে চাপা পড়ে থাকে এই অনাবৃত আকাশের তলায় আলোয়-বাতাসে হঠাৎ বুঝি অসীম বিস্তার নিয়ে রাজসিংহের চোখের এপার ওপার ঢেকে ফেলে। মনে হল চোখে আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। অন্ধ হয়ে গেল নাকি। ভীরু বিহ্বলতা সহসা বুঝি সাহসী হয়ে রক্ত কণিকার সমাবেশে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আর তার ফলে শরীরের আনাচে-কানাচে অগ্ন্যুৎপাত, প্লাবন, ভূমিকম্প নিঃশব্দে বিপর্যয় ঘটাতে লাগল। এক সময় মনে হল নিজেকে বুঝি সামলাতে পারবে না রাজসিংহ। মনের মধ্যে কী একটা অসুখ ইচ্ছে-অনিচ্ছেকে ভেঙে-চুরে ছারখার করে দিয়ে ফেরার হতে চায়।

হঠাৎ দূর থেকে মেয়েলি গলার সম্মেলক ভেসে এল, কিছু কলকণ্ঠের কথা। উচ্ছ্বাস আর হাসিও।

নড়েচড়ে বসল রাজসিংহ। নিজেকে ঝোপঝাড়ের আড়ালে সরিয়ে নিল। কে জানে কেউ যদি আবার দেখে ফেলে। কৈফিয়তে কাজ হবে না তখন!

একদল দেহাতি মেয়ে কলসী মাথায় করে জল নিতে এসেছে। তাদের কথায় আর হাসিতে মুখর হয়ে উঠল রেচানার গাছের নিচে ঝিরঝিরাইয়ার ঝর্ণাতলা।

সাহস পেল রত্নাবলী। হাতছানি দিয়ে ডাক দিল মেয়েদের একজনকে। ইশারা করল, কাপড় ব্লাউজ তার হাতে দিতে। কোন রকমে কাপড়ে নিজেকে ঢেকে জল থেকে উঠে পড়ল রত্নাবলী। তারপর গাছের আড়ালে গিয়ে নিজেকে সামলে-সুমলে বেরিয়ে পড়ল পাহাড়ের আড়াল থেকে। তারপর মেয়েদের সঙ্গে টুকি-টাকি দু'একটা কথা বলে মাঠে নেমে পড়ল। বড্ড দেরী হয়ে গেছে তার। মৃগাঙ্ক ঘুম থেকে উঠে থাকলে বড্ড বকাবকি করবে তাকে। যেতে যেতে রত্নাবলী প্রতিজ্ঞা করল, আর কোনদিন একলা আসছে না।

গাছপালার আড়ালে কোথায় একটা তিতুর ডাকছিল। রত্নাবলীর পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল রাজসিংহ। চোখের সামনে রত্নাবলী ক্রমশ মিলিয়ে গেল। মেয়েরা কখন জল নিয়ে চলে গেছে। ঝিরঝিরাইয়ার ঝর্ণাতলায় বাতাসের ফিসফিস কী যেন খুঁজে মরছে।

রাজসিংহ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। দূরে ফার্মহাউস দেখা যাচ্ছে। মাঠ-ভরা অন্ধকারের মধ্যে একটুখানি আলোর আভাস সেখানে স্পষ্ট হয়ে আছে।

কান পাতলে তখনো তিতুরটার ডাক শোনা যায়। ঝোপঝাড়ের আড়ালে বসে তখনো কাউকে ডেকে যাচ্ছে। একটানা উদাস কান্না-কান্না একটা ডাক।

মাঠের দিগ্বিদিকে উদভ্রান্ত রাজসিংহ এলোমেলো পা ফেলে কোনদিকে যে হাঁটছিল সে কথা তার নিজেরই জানা ছিল না।

অনেক রাতে ফিরল রাজসিংহ।

রত্নাবলী ছুটে এল সামনে, কোথায় গেছিলে গো ঠাকুর-পো?

রাজসিংহর কী রকম লজ্জা-লজ্জা করে রত্নাবলীর সামনে। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে উত্তর দেয়, ওই মাঠের দিকে—।

সে-জায়গাটা যে কোথায় সেটা বুঝতে না পেরে রত্নাবলী বলল, তোমার চা জুড়িয়ে জল হয়ে গেল, কখন চা করে রেখেছি! ভাবছি, এই আসছ, আর এলে একেবারে রাত কাটিয়ে—

পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম।

ভালোই করেছিলে। তা পথটা আবার পেলে কী করে?

শুনে তোমার লাভ হবে না। তার থেকে খেতে দাও। শুয়ে পড়ি। বড্ড ধকল গেছে আজ। মনে-মনে এক অস্বস্তি বড্ড যন্ত্রণা

দিচ্ছিল। সাপের খোলস ছাড়লে যেমন নির্জীব হয়ে পড়ে রাজসিংহও যেন তেমনি ঝিমিয়ে গেছিল।

খেতে বসে একটাও কথা বলল না রাজসিংহ। কোন রকমে মাথা গুঁজে খেয়ে উঠল।

তার হাল-চাল সন্দিগ্ধ করে তুলেছিল রত্নাবলীকে। বলল, সারক্ষণ মাথা গুঁজে কি ভাবছ বলো তো?

কিচ্ছু না। রত্নাবলীর দিকে এক পলক তাকিয়ে মুখটা অন্ধকারের দিকে ফিরিয়ে নিল রাজসিংহ।

পথে কোন পরি-টরি দেখা দেয় নি তো?

অদ্ভুত একটা শব্দ করল রাজসিংহ। তারপর জলের গেলাসটা নিঃশেষ করে উঠে সোজা হয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

একটু পরে মৃগাঙ্ক ফিরে জিজ্ঞাসা করল, রাজা ফিরেছে?

এই তো একটু আগে ফিরল।

কোথাও গেছিল নাকি?

না, বলল, পথ ভুল করে ঘুরে মরেছে।

অমনি করেই একদিন মরবে এখানে থাকলে। ভূত-প্রেতের হাতে না মরলেও জানোয়ারের হাতে মারা পড়বে। এত করে বললেও শোনে না। ছোটবেলা থেকেই একগুঁয়ে—

তোমার খাবার দি।

রাজা খেয়েছে?

কখন।

তা হলে আর দেরি করে লাভ কি।

অন্ধকারে নিজের ঘরে গিয়ে ঘুমোয় নি রাজসিংহ। বিছানায় শুয়ে চোখ রেখেছিল রত্নাবলীর উপর। বিকেলবেলায় চোখে দেখা মায়াবী স্বপ্নের পুতুলটাকে রত্নাবলীর মধ্যে খুঁজে খুঁজে হয়রান!

খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে রত্নাবলী ঘরে ঢুকলে মৃগাঙ্ক দরজা দিল।

অন্ধকারে শুয়ে দেখল রাজসিংহ। অনেকক্ষণ অন্ধকারে শুয়ে থেকেও তার ঘুম এল না। এপাশ-ওপাশ করে উঠে পড়ল। জানালার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে একবার তাকাল তারপর ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল।

রত্নাবলী-মৃগাঙ্কর শান্তি-নিকেতন এখন নিঝুম।

রাজসিংহ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মৃগাঙ্কদের দরজার সামনে হাজির হল। ঘরের দরজায় কান দিয়ে কথাবার্তা শুনতে, চাইল। হঠাৎ একটা ছেঁদা আবিষ্কার করে কলম্বাসের মতো সুখী হল, স্তিমিত আলোয় দেখল রত্নাবলী চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে আয়নার কাছ থেকে সরে গিয়ে মৃগাঙ্ককে একটা চুমু খেল, এই ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

উঁ। চোখ মেলে তাকাল মৃগাঙ্ক, কি বলছ?

জানো আজ বড় বিপদে পড়ে গেছিলাম।

কিসের বিপদ?

একটু থেমে রত্নাবলী বলল, আজ ঝিরঝিরাইয়াতে স্নান করতে নেমেছি, ওমা, কোত্থেকে কে একজন শিস দিচ্ছিল, আমি কিছুতে আর জল থেকে উঠতে পারি না—

তারপর? উত্তেজনায় উঠে বসে মৃগাঙ্ক।

তারপর আর কি। রত্নাবলীর গলার স্বর সহজ হয়ে আসে, কতকগুলো দেহাতি মেয়ে সেই সময় জল নিতে এসেছিল, তাই কোন রকমে পালিয়ে আসতে পেরেছিলাম।

আমার তো মনে হচ্ছে রাজা ছাড়া আর কেউ নয়।

ধুর, ঠাকুরপো হতে যাবে কেন?

আমি তোমাকে বলছি রত্না, রাজা ছাড়া আর কেউ নয়—

কী যে তুমি বল! রত্নাবলী যেন নিজেকে অপরাধী মনে করে,

াকুরপো ওখানে যাবে কেন! সাপে কামড়ানোর পর থেকে জঙ্গলের দিকে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে—

(বাঃ বৌদি, তুমি আমার পক্ষে চমৎকার সওয়াল করলে। মনে-মনে কথা বলে রাজসিংহ, তোমার চেহারাটা তো তুমি দেখতে পাও না, তাই বুঝতে পার না তোমার রূপে বিষ আছে। তাই তো মেজদা, বুড়ো বয়সে বৌ আর ছেলেপুলে ফেলে তোমার শরীরে আত্মঘাতী হল! এখনো রোমান জেনারেলের মতো ক্লিওপেট্রার রূপ তারিয়ে-তারিয়ে ভোগ করছে।)

রত্না তুমি তো রাজাকে চেন না, আমি ভালো করে চিনি। ও আসবার পর থেকে সব সময় আমার আতঙ্ক—

কেন গো?

সে তুমি বুঝবে না। কাল সকালে উঠেই হতভাগাকে বলে দিতে হবে। অনেকদিন হয়ে গেল এবার পথ দেখ--

ছিঃ, তোমার ভাই না! ধমক দিল রত্নাবলী।

সংসারে আমি অশান্তি চাপিয়ে রাখতে চাই না।

(ভালো, মেজদা ভালো। রাজসিংহ তারিফ করে মৃগাঙ্ককে, তোমার সংসারে চিরকালের জন্য অশান্তির ভার আমি চাপিয়ে রাখতে চাই না। চলেই যাব। যাবার আগে তোমার সংসারের ফুলদানিতে জিইয়ে রাখা নীল ফুলটাকে একটু নাড়া দিয়ে যাব।)

চলেই তো যাবে। বেচারাকে আর কষ্ট দিও না। এমনিতে মনে হয়তো—

তোমার অত ভাবনা ভাবতে হবে না। চুল আঁচড়ানো হয়ে গেছে?

কেন?

আলোটা নিভিয়ে দিয়ে কাছে এসো—

না। রত্নাবলীর গলায় যেন দৃঢ়তার আভাস।

কেন?

আমার শরীর ভালো নেই—

ওসব বাজে কথা রাখো—

সত্যি বলছি।

আঃ রত্না, আলোটা নিভিয়ে দিয়ে কাছে এসো বলছি।

না।

(বাঃ বৌদি, সাবাস দিল রাজসিংহ, তুমি বুড়োটাকে বেশ খেলাচ্ছ।)

কেন?

প্রত্যেকদিন তুমি জানোয়ারের মতো আমার শরীরটাকে ছিড়বে, কামড়াবে নিজের দরকারে এ আমার ভালো লাগে না আর। এতটুকু ভালোবাসা নেই, আদর নেই।

অনেক রাত হয়ে গেছে কিন্তু। মৃগাঙ্ক উঠে আলোটা নিভিয়ে জানালার দিকে এগোল।

আলো নিভিয়ে দিতে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল।

(অন্ধকার। হাসল রাজসিংহ, এখন আর চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু কল্পনা করতে পারছি, ক্ষুধার্ত একটা চিতা তার শিকারের উপর লাফিয়ে পড়বার চেষ্টা করছে।)

একি কোথায় গেলে? মৃগাঙ্কর গলার স্বর শোনা গেল।

রত্নাবলীর কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

দরজার গায় দাঁড়িয়ে রইল রাজসিংহ। তারপর বোঝা গেল মৃগাঙ্ক রত্নাবলীকে খুজে পেয়েছে।

সারারাত এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি?

তুমি ঘুমোও গে। আমি একটু পরে যাচ্ছি।

তোমার যে মাঝে-মাঝে কী হয়!

কিচ্ছু হয়নি তো। রত্নাবলীর গলা যেন ভেজা-ভেজা।

দরজা থেকে সরে এল রাজসিংহ। ঘর-বাড়ির এই বাঁধন আ

ভালো লাগছে না। জালের দরজা খুলে গমের ক্ষেতের মধ্যে নেমে দাঁড়ালো।

দু'তিন দিন হল রাজসিংহের কোন খোঁজ নেই।

রত্নাবলী বলে, একবার খোঁজ নিলে হত না?

কোথায় খোঁজ নি বল দেখি! চারদিকে তো জঙ্গল, কোন দিকে গেছে কিছু বুঝতে পারছি না। এমন উটকো জঞ্ঝাট সামলাব, না নিজের কাজ করব!

তোমাদের চনিলালের কাছে একবার খোঁজ নিলে পারতে, আজকাল তোমার ভাই তো সকাল হতে না হতে চনিলালের বাড়ির দিকে পা বাড়ায়, চায়ের লোভে—

গেছিলাম তো সেই খোঁজে চনিলালের বাড়ি, সেও তো ফেরে নি—

আমার মনে হয় ঠাকুরপো চলে গেছে। মানুষ নেই জন নেই, খাঁ-খাঁ করা জায়গা কার ভালো লাগে!

ওকে নিয়ে আমার কোন ভাবনা হয় না। এমন পোড়-খাওয়া ছেলে যে ঠিক আবার ভেসে উঠবে দেখো। অত ব্যস্ত হবার কিছু নেই। তুমি বরং একটু চা দাও তো আমাকে, একবার চনিলালের বাড়িটা ঘুরে আসি—

রত্নাবলী চা নিয়ে আসবার আগে চনিলাল এসে হাজির হল।

আরে চনিলালজী যে আসুন-আসুন! জালের দরজাটা খুলে দিল মৃগাঙ্ক।

আপনাকে খবরটা দিতে এলাম। গাঙারা ডোঙরির গায় একটা গ্রামে থেকে গেছে রাজসিংহ। বলল, আমার দাদাকে একটা খবর দিয়ে দেবেন চনিলালজী।

আপনি না নিয়ে গেলে ভালো করতেন চনিলালজী। মন্তব্য করে মৃগাঙ্ক।

পাহাড়ি নদীর মতো আঁকাবাঁকা কপালের রেখা আরো স্পষ্ট করো

চনিলাল বলে, সেটা আগে বুঝতে পারি নি। সেখানে গিয়ে বুঝলাম। গরুর পাল নিয়ে রাখালেরা ঘন ঘাসের এলাকায় ঢুকে পড়ছিল, তাদের খুঁজতে সেই এলাকায় গিয়ে হাজির হলাম, বহুলা গাঁয়ে সেদিন কী একটা উৎসব ছিল। সেখানে দিশি চোলাইয়ের ঢালাও কারবার আর মেয়েদের নাচের আয়োজন। খোলা মাঠের তলায় বনের কিনারায় সারারাত চলবে সেই উৎসব। আপনার ভাই বলল, চনিলালজী একটু দেখে গেলে হয় না? আমি বললাম রাত হয়ে যাবে। বলল, তা' হোক আমরা সহুরে লোক এসব দেখার সুযোগ বড় একটা পাই না। আমি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম রাতে এসব মত্ততার আসরে খুন-জখম পর্যন্ত হয়ে যায়। তা' আপনার ভাই নাছোড়বান্দা। বলল, চনিলালজী আপনি চলে যান, আমি কাল সকালে পৌঁছে যাব।

চা এনে দরজার গোড়ায় থেমে গেল রত্নাবলী।

কি আর করি, আপনার ভাইকে একলা ফেলে আসতে সাহস পেলাম না।

আপনি নিয়ে গেলেন কেন? একটু বিরক্ত হল মৃগাঙ্ক।

সবই কপাল মশাই, কপাল! আপনি জানেন বোধ হয় সকালে আমার ওখানে চা খেতে যায়, ক'দিন ধরে বলছিল, চনিলালজী ভাবছি আপনার সঙ্গে বের হব একদিন।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

বলল, জায়গাটা একটু ঘুরে-টুরে দেখব কিছু একটা ব্যবসা করা যায় কি না।

ভাবলাম, যাযাবর ছেলেটার যদি একটা হিল্লে হয়। কাঠের ব্যবসা দুধের ব্যবসা যা হোক কিছু একটা করতে পারবে। তা সেখানে তারার আলোয় ছত্তিশগড়ী মেয়েদের ঠাস-ঠসক দেখে তার মাথা গেল ঘুরে! চোখ দিয়ে ইশারা করল চনিলাল, ডোঙরির চেয়ে মিশমিশে কালো সুঠাম চেহারার মেয়ে, বুকগুলো শাল গাছের মতো খাড়াই, ঢাল বেয়ে নেমে এলে ঘাঁটিতে পৌঁছন যায়! হাসে চনিলাল।

দরজার ফাঁক দিয়ে চকচকে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে রত্নাবলী অবাক হয়ে শোনে।

রাজসিংহ তাদের সঙ্গে নাচবে শুনে মেয়েদের মধ্যে হুল্লোর পড়ে গেল। তারা দল বেঁধে গান ধরল: কালো টুরি বায়না ধরেছে। হার লিবে ঝুমকা লিবে! পা সাজাবে মলে!

একটু দম নিয়ে চনিলাল গলাটা কেশে একটু পরিস্কার করে নিল।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বলবেন। আসুন না, বসা যাক—

তাই ভালো। চনিলাল বারান্দায় উঠে বসে।

ঘরের ভিতরের দিকে মুখ ফিরিয়ে মৃগাঙ্ক বলল, আমাদের দু-কাপ চা দাও না। চনিলালজী এসেছেন। বলুন, তারপর কী হল—

জালা-ভরা মহুয়ার তাজা মদ। শাল পাতার ঠোঙায় ভর্তি করে সবাই গলায় ঢেলে দিচ্ছে। পেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে রক্তে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। রাজসিংহ এগিয়ে গিয়ে মেয়েদের হাত থেকে একটা ঠোঙা নিয়ে ঢকঢক করে গলায় ঢেলে দিল। বসন্তে মাঠ ভরে চিস্‌মি ফুল ফোটে, মিষ্টি তার বাস। মেয়েদের গলায় সেই চিস্‌মির মালা, খোঁপায় গোঁজা চিস্‌মির থোকা। তার সঙ্গে মেয়েদের গায় মিশে আছে মহুয়ার খুবসুরৎ খুসবু। ছেলেরা ঢোলক নিয়ে বসেছে।

হাত বাড়িয়ে মেয়েদের একজন রাজসিংহকে টেনে নিল।

তখন সন্ধ্যে হয়ে আসছে। সূর্য পাহাড়ের ওপারে নেমে গেছে। পাখিদের কাকলির সঙ্গে মেয়েদের কলহাস্যের উচ্ছ্বাসে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। তারা নতুন করে কলি ধরেছে: কালো টুরি বায়না ধরেছে!···

ভাবলাম থেকে যাই। রাখালের দলের সঙ্গে ঠিকে ছাউনি করার মতো মালপত্তর থাকে। যেখানে সন্ধ্যে হয় সেখানেই ছাউনি ফেলে। আমি রাতের মতো সেখানে গিয়ে ঠেক নিলাম। সারারাত ধরে উৎসবের গান বৃষ্টির ছাটের মতো আমার ছাউনি ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

সকালে উঠে গেলাম গাঁয়ে। গিয়ে দেখি কেউ নেই। দু-একজন

বুড়োবুড়ি যারা ছিল তারা বলল, সবাই শিকারে গেছে। সন্ধ্যের আগে ফিরবে না।

ভাবলাম আজকের দিনটা মাঠে কাটিয়ে যাই, সন্ধ্যেবেলা রাজসিংহকে সঙ্গে নিয়ে ফিরব।

সন্ধ্যেবেলা গাঁয়ের যুবক-যুবতীরা ফিরল। সঙ্গে বুনো শুয়োর, হরিণ সজারু। খোঁজ নিলাম গিয়ে, দেখি সবাই ফিরছে। শুধু রাজসিংহ নেই তাদের মধ্যে। জিজ্ঞাসা করলাম, রাজসিংহ ফেরেনি? কেউ হাসল। কেউ বলল, না। কেউ বলল, বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছে বোধ হয় তারা! জিজ্ঞাসা করলাম, সঙ্গে কেউ আছে নাকি? হুঁ-উ। উত্তর দিল মেয়েদের কেউ। শুনলাম, তার সঙ্গে আছে গাঁয়ের সবচেয়ে তাজা আর সুন্দরী মেয়ে। এইখানে এসে থেমে গেল চনিলাল। তারপর মাথাটা নেড়ে বলল, কাল রাতে ফিরতে দেরি হয়ে গেছিল তাই আসতে পারিনি খবর দিতে—

রত্নাবলী চা নিয়ে এল।

চনিলাল হাত তুলে বলল, নমস্তে ভাভীজি! খবর সব ভালো তো?

চনিলালের হাতে চায়ের কাপ তুলে দিয়ে রত্নাবলী উত্তর দিল, ভালোই—

দেখুন তো ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে আপনাদের কী ঝঞ্ঝাটে ফেললাম। আফশোষ করে চনিলাল।

আপনার আর দোষ কী! সে তো আর ছেলেমানুষ নয়—

কী জানি ফিরলে বাঁচি। চায়ে চুমুক দিল চনিলাল।

মৃগাঙ্ক গুম হয়ে বসেছিল। অনেকক্ষণ বাদে বলল, ফিরে এলেই তাকে তাড়াবার ব্যবস্থা করব। পরিস্কার বলে দেব, আর এখানে নয়। বড্ড জ্বালাচ্ছে—

চা শেষ করে চনিলাল উঠল, এখন তাহলে চলি ওদিকে গিয়ে একটু খোঁজ খবর করি। আমি অবিশ্যি ভয় দেখিয়েছি, রাজসিংহর কিছু হলে কারো রক্ষে থাকবে না।

চনিলালের সঙ্গে মৃগাঙ্কও বারান্দা থেকে নিচে নামল তাকে এগিয়ে দিতে।

চনিলাল একটু এগিয়ে মৃগাঙ্কর কানের কাছে ফিসফিস করে, আসলে ভয়টা কি জানেন, এ বয়েসে তো হিসেব-কিতেব থাকে না। রোগ টোগ না ধরে ফেলে। অমায়িক একটা হাসি চনিলালের মুখে একটু-একটু করে ছড়িয়ে পড়ে, ভারি মুসকিলের ব্যাপার বুঝেছেন কিনা!

বলেন কী ?

বনের মানুষ তো এরা, আমাদের মতো এত বাদবিচার এদের নেই। কেউ ভালোবেসে একটা বিড়ি দিলে তার সঙ্গে শুতে গররাজি হয় না! চারদিকে একবার দেখে নিয়ে চনিলাল বলল, এবার আপনার গমের ফসল ভালোই হয়েছে দেখছি। আর দেরি করছেন কেন, ফসল কেটে ঘরে তুলুন। এবার ধান দেবেন তো জমিতে ?

দেখি। নীলগাই আর হরিণের যা উৎপাত ফসল ঠেকানো মুসকিল। পরশু রাতেও নীলগাইয়ের দল এদিকে হানা দিয়েছিল। ফাঁকা আওয়াজ করতে তবে পালালো।

হাসলো চনিলাল, এখানে এই বড়ো মুসকিল। তবে বেচারাদের ঘাসের জমি দখল করেই তো আপনারা ফসল ঘরে তুলছেন! আচ্ছা চলি, সন্ধ্যের দিকে যদি পারেন তো আসবেন। দেরি করেনা চনিলাল। হনহন করে হেঁটে যায়।

দুপুরের পর হঠাৎ কালো হয়ে গেল আকাশ। শনশন করে হাওয়া বইতে সুরু করল। একটু আগে দুপুরের গায় যে বিকেলের রঙ হলুদ হয়ে উঠছিল কোথায় মিলিয়ে গেল! সোনার দানার মতো পাকা গমের মঞ্জরী বাতাসের ঝাপটা খেয়ে মাথা দোলাতে লাগল। রান্নাঘরে কী একটা কাজে ব্যস্ত ছিল রত্নাবলী। হঠাৎ মেঘ করে আসতে হাতের কাজ ফেলে সদরে চলে এল। ঠাকুরাণী পাহাড়ের মাথায় নীল মেঘ থমথম করছে।

মৃগাঙ্ক তখনো ঘুমুচ্ছিল। রত্নাবলী তাকে ধাক্কা দিয়ে তুলে দিল, এই ওঠ, দেখ কী কালো মেঘ করেছে!

মেঘ করেছে! ঘুম থেকে জেগে অবাক হল মৃগাঙ্ক।

দেখ না একবার চেয়ে!

মৃগাঙ্ক উঠে দেখে নীলচে-কালো মেঘ ফেটে ছড়িয়ে যাচ্ছে চারদিকে, অকাল-সন্ধ্যার ছায়া গাছপালার ওপর দিয়ে পাখির মতো উড়ে যাচ্ছে দিগ-দিগন্তে।

কী ভাবছ? স্বামীর পাশ গিয়ে দাঁড়ায় রত্নাবলী।

যদি শিল পড়ে এবারে ফসলের পুরোটাই বরবাদ হয়ে যাবে।

ঘর-দোর মুহূর্তে সব অন্ধকার হয়ে হয়ে গেল। হঠাৎ বাতাস পড়ে এল। তারপর তেড়ে বিষ্টি এল। চকচকে বিষ্টির ফোটা ঝরঝর করে নেমে আসে ঘাসের শিসে, মাটিতে, আদিগন্ত মাঠের প্রসারে।

বসন্তের বিষ্টিতে কি রকম মায়াবি মোহ যেন পেয়ে বসেছিল রত্নাবলীকে। সে মৃগাঙ্ককে ডাক দিল এই—এসো না।

কী বলছ? আড় চোখে একবার রত্নাবলীকে দেখে নিল মৃগাঙ্ক।

দেখ কী সুন্দর বিষ্টি এসেছে। আমার কাছে বোস না।

ঈশ এবার গম কাটতে এত দেরী করে ফেললাম। ভাবল মৃগাঙ্ক।

রত্নাবলী নিজের মনে বলে যায়, চলো না দুজনে বিষ্টিতে একটু ভিজি।

তৃষ্ণার্ত গমের শিষে, পাতায় বিষ্টি পড়ার মৃদু শব্দ বেজে চলেছে।

বারান্দা থেকে সিঁড়ির ওপর নেমে দাঁড়ায় রত্নাবলী। বিষ্টির জলের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। তার গলায় ছেলেমানুষি খুশি গুনগুনিয়ে ওঠে।

মিশমিশে কালো অথচ স্বচ্ছ অন্ধকারে ফার্ম হাউস ঢাকা পড়ে গেল। টিনের ঘরের চালে বিষ্টির শব্দের নুপুর একটানা দ্রুত লয়ে নেচে চলেছে রিমঝিম। রিমঝিম।

খানিকটা বিষ্টির জল হাতে নিয়ে রত্নাবলী মৃগাঙ্কর দিকে ছুড়ে দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল।

কী অসভ্যতা করছ?

মৃগাঙ্কর শানানো গলা খচ্‌ করে রত্নাবলীর কানে এসে বিঁধল। গ্রাহ্য করে না রত্নাবলী। আরেক আঁচলা জল মৃগাঙ্কর গায়ে ছুঁড়ে দিল। কনকনে ঠাণ্ডা জল মৃগাঙ্কর গায়ে লাগতে ক্ষেপে তেড়ে এল রত্নাবলীর দিকে, কী ইয়ার্কি করছ? অন্য কেউ হলে এক চড় কষিয়ে দিতাম।

রত্নাবলীর খুশির বেলুনটা হঠাৎ বুঝি পিনের খোঁচা লেগে ফেটে গেল।

চড় কষিয়ে দিতে! ভুরু কুঁচকে তাকায় রত্নাবলী।

দিতাম বৈকি। মৃগাঙ্ক রাগে গরগর করে ওঠে, ঘুম থেকে সবে উঠেছি এখন ঠাণ্ডা জল গায়ে দিলে কার ভালো লাগে!

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রত্নাবলী।

আমার যাচ্ছে মাথা খারাপ হয়ে! মৃগাঙ্ক বকবক করে যায়, যদি শিল পড়ে, কত টাকার ফসল নষ্ট হয়ে যাবে। কি করি বুঝতে পারছি না। এসে অবধি টাকা খরচ করে যাচ্ছি। তেমন একটা ফসল ঘরে তুলতে পারলাম না। একটু চা দাও তো, বেরুতে হবে। দেখি দু' চারজন লোক জোগাড় করতে পারি কি না। কাল সকালে যে করে হোক ফসল কেটে তুলতে হবে।

রত্নাবলী কোন কথা না বলে ভিতরে চলে গেল।

ইতিমধ্যে রেনকোট পরে জীপের চাবি নিয়ে তৈরী হয়ে নিল মৃগাঙ্ক। রত্নাবলী চা এনে দিতে মৃগাঙ্ক চা খেতে খেতে বলল, তুমি দরজাটা বন্ধ দাও—

একলা আমি থাকতে পারব না।

আমি নাচার। এখন বেরুতে না পারলে কোন কাজ হবে না।

এই বিষ্টি-বাদলে অন্ধকারে থাকতে আমার ভয় করে।

অনেকদিন তো এখানে কাটালে। মৃগাঙ্কর মুখটা ক্রূর হয়ে উঠল,

তা' ছাড়া এখন তুমি আর কচি খুকিটি নয়। রেন কোটের টুপিটা মাথায় দিয়ে বিষ্টির মধ্যে নেমে গেল মৃগাঙ্ক, দরজাটা বন্ধ করে দাও, আমার রাত হতে পারে ফিরতে।

দরজা খোলা পড়ে রইল। রত্নাবলীর খেয়াল নেই। সে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

মৃগাঙ্কর অপসৃয়মাণ ছায়াটা বিষ্টির মধ্যে মিলিয়ে গেল। একটু পরে জীপের শব্দ পাওয়া গেল দরজার গায় হেলান দিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল রত্নাবলী। তার মনের মধ্যে অসংখ্য ভাবনা সাপের মতো কিলবিলিয়ে হাঁটাচলা সুরু করল।

অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে। দিগ-দিগন্ত বিষ্টিতে আচ্ছন্ন। ঠাকুরাণী পাহাড়ের আবছা ছায়াটা বিষ্টিতে ধুয়ে প্রায় অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। আরেকটু পরেই হয়তো মুছে যাবে।

সেই অন্ধকারে রত্নাবলীর দাঁড়িয়ে মনে হল, সে বোধ হয় ভুল করেছে। মল্লিকবাড়ির সুদৃঢ় আশ্রয় থেকে কোন মোহে একদিন অনুদ্দেশ হয়ে ছুটে এসেছিল এখানে! আজ মনে হচ্ছে তার ভুল হয়ে গেছে।

মৃগাঙ্ক আজকাল কেমন যেন মিইয়ে এসেছে। সেদিন ঠাকুরাণী পাহাড়ের ওপরে উঠতে গিয়ে বসে পড়েছিল মাটিতে। তারপর রত্নাবলীর দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার সঙ্গে পাল্লা দি তেমন ক্ষমতা আমার নেই। শুনে রত্নাবলীর সে কি হাসি, তুমি বোধ হয় বুড়ো হয়ে যাচ্ছ! স্তিমিত চোখদুটো মেলে রত্নাবলীর হাসির সঙ্গে হেসেছিল মৃগাঙ্ক। কোন উত্তর দিতে পারেনি।

প্রথম যখন ভাণ্ডারা জেলায় এসেছিল মৃগাঙ্ক, তখন যেন বুনো ঘোড়ার মতো ছুটোছুটি করত। হাত বাড়িয়ে রত্নাবলী তাকে ছুঁতে পারত না। সেই মৃগাঙ্ক দুপুরে খাবার পর ঘুমোনোর কথাটাই ভাবে এখন। আগে দরকার-অদরকারে বন্দুক নিয়ে জঙ্গলে গিনি ফাউল

মারতে যেত। আজকাল কদাচিৎ তার তেমন ইচ্ছে হয়। হরিণ, নীলগাই কি বারোশিঙা ফসলে হামলা করতে এলে রত্নাবলী মৃগাঙ্ককে কিছুতে ডেকে তুলতে পারে না। বলে, আঃ বিরক্ত করো না। তোমার ফসল নষ্ট হয়ে যাবে যে। উত্তর দিয়েছে রত্নাবলী, যাক গে। বলে পাশ ফিরে শুয়েছে মৃগাঙ্ক। যৌবনের অসুখ থেকে বার্ধক্যের সুখের দিকে সে ঝুঁকে পড়েছে।

রত্নাবলীর ভাবনাটা হঠাৎ কী রকম ভারি হয়ে এল, এই খেলাঘর (খেলাঘর ছাড়া রত্নাবলী কী বলবে একে!) যদি ভেঙে যায়, মৃগাঙ্ক হয়তো তার পুরোন সংসারে ফিরে যাবে। হয়তো আশ্রয়ও পাবে। বৌ ছেলেপুলের মাঝখানে মিশে গিয়ে ভাণ্ডারা জেলার নির্বাসনের দিনগুলো সহজে ভুলে যেতে পারবে। কিন্তু রত্নাবলী কি করবে, সে কোথায় যাবে! তার পক্ষে তো মল্লিকবাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে এগোন নিতান্ত ঝুঁকি হবে। বাবাকে তো ভালো করে চেনে রত্নাবলী। কারো প্রতি বিরূপ হলে তিনি পাথরের মতো কঠিন। ফিরে গিয়ে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা আর পাথরে মাথা ঠুকে মরা একই ব্যাপার।

নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হয় রত্নাবলীর। এই যে ফাঁকা মাঠের মাঝে ঝড়-বাদলের দিনে একলা ফেলে যাওয়া এসব তো অশুভ সংকেত বয়ে নিয়ে আসছে। সত্যি যদি মৃগাঙ্কর সেই ভালোবাসার এতটুকু তার মনে থাকত তবে কী রত্নাবলীকে একলা এমন করে ফেলে যেতে পারত।

রত্নাবলীর চোখ বেয়ে বিষ্টির ফোঁটার মতো জলের ধারা নেমে এল। মৃগাঙ্কর কাছ থেকে হঠাৎ পাওয়া এই আঘাত তার বুকের সমস্ত কান্না যেন নিঙড়ে নিয়ে আসে। খাটের ওপর উপুড় হয়ে আকাশ-পাতাল ভাবনার ঢেউয়ে দিশেহারা হয়ে যায় রত্নাবলী।

বাইরে দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে গেল। ভিজে জবজবে একটা

ছায়া ভিতরে এসে দাঁড়াল। এঘরে ওঘরে হানা দিয়ে শেষে রত্নাবলীর ঘরের দরজায় এসে থামল।

বিষ্টি অনেকক্ষণ থেমে গেছে। মেঘ-ভরা আকাশের মুখ থমথম করছে। কখনো কখনো বিদ্যুতের চমকানি মেঘলা আঁধারকে ছারখার করে দিচ্ছে।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সেই ছায়া আলতো হাতে পর্দা তুলে ঘরের মধ্যে চোখ ফেলল। অন্ধকারে কিছু বোঝা গেল না প্রথমে—চোখটা একটু ধাতস্থ হয়ে এলে রত্নাবলীর শরীরটা স্পষ্ট হয়ে উঠল ক্রমশ।

সাহসে ভর করে সেই ছায়া ঘরের ভিতর পা বাড়ালো। অত্যন্ত সঙ্কোচ আর দ্বিধায় পা ফেলতে গিয়ে চেয়ারের সঙ্গে ধাক্কা লাগতে অপ্রাকৃত একটা শব্দ নির্জনতার মধ্যে সাপের মতো নড়েচড়ে উঠল।

চমকে উঠে রত্নাবলী মুখ ফিরিয়ে দেখে কে একজন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারে সে অনুভব করল, মৃগাঙ্ক ছাড়া কেউ নয়। কী মনে হল আর সমস্ত অভিমান নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার বুকে, এতক্ষণে এলে!

দুটো হাত রত্নাবলীকে বুকের মধ্যে টেনে নিল।

ওমা, এ যে একেবারে ভিজে। হাত বাড়িয়ে মুখে হাত দিয়ে রত্নাবলীর বুকের ভিতর ছ্যাঁৎ করে উঠল, কে?

আমি।

ঠাকুর-পো!

রত্নাবলীর আলুলায়িত চুলে ঢাকা মুখে চুমু খেয়ে রাজসিংহ বলল, হ্যাঁ।

ছেড়ে দাও।

আমি কি তোমাকে ধরতে গেছি, তুমিই তো ঝাঁপিয়ে পড়লে এসে। অন্ধকার বাড়ি। দরজা খোলা। কারো সাড়া নেই। অবাক হয়ে গেলাম। এ-ঘর সে-ঘর খুঁজে তোমার ঘরে দেখি কে একজন

বিছানার ওপর শুয়ে আছে। বিশ্বাস করো, ভাবতেই পারি নি তুমি। আর যখন আমার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে তখন অবাক হয়ে গেলাম। যাই হোক, কিছু মনে ক'রো না বৌদি।

রত্নাবলী রাজসিংহকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কী হ'ল বৌদি ছেড়ে দাও আমাকে—

যদি না ছাড়ি ?

আমার পক্ষে মুসকিল হবে। কাল সকালে তুমি হয়তো দাদাকে রিপোর্ট করবে আর দাদা বন্দুক নিয়ে—। খিক-খিক করে হাসে রাজসিংহ।

এ ক'দিন কোথায় ছিলে ?

একটু এঞ্জয় করে এলাম। তোমরা তো এখানে সাধু-সন্তের মতো জীবন কাটাও। আমার অসহ্য হয়ে গেছিল।

তোমার দাদা কিন্তু সব শুনেছে—

কী শুনেছে ?

তোমার কাণ্ড-কারখানা—

কী কাণ্ড-কাণ্ডকারখানা ?

চনিলাল তোমার দাদাকে বলছিল সব। আমিও শুনলাম।

দাদা বোধ হয় শুনে খুব খেপে আছে, না বৌদি ?

কি জানি!

রত্নাবলীকে দুহাতের মধ্যে তুলে বিছানার দিকে নিয়ে যেতে যেতে রাজসিংহ বলল, এখানে আমার থাকার পাট চুকল। বুঝতে পারছি কেটে পড়তে হবে। ভাবছি, তোমাকে নিয়ে কেটে পড়লে কেমন হয় ?

খাটের উপর রত্নাবলীকে শুইয়ে দিল রাজসিংহ।

পারবে ? বিছানার ওপর সোজা হয়ে বসে রত্নাবলী।

রাজসিংহ মিত্তির পারবে না এমন কাজ পৃথিবীতে খুব কম আছে। তা, তুমি পালাবে কেন বৌদি ?

এই নির্জনতা আমার ভালো লাগছে না। আমি মানুষের মধ্যে ফিরে যেতে চাই। আমার কাছে এখন এসব অসহ্য, অসহ্য।

নির্জনতা ভালো লাগছে না—না, বুড়ো দাদা তোমার সঙ্গে তাল সামলাতে পারছে না? খানিকটা হেসে রাজসিংহ হঠাৎ ভয় পাওয়া গলায় বলল, দাদা এসে পড়বে না তো?

জানি না।

রত্নাবলীর গালে একটা টোকা দিয়ে রাজসিংহ বলল, বৌদি তুমি দেখছি এখন পুষির মতো পোষমানা। পরে আবার থাবা-টাবা বের করবে না তো? খুশিতে শিস দিল রাজসিংহ, পুষি-পুষি-পুষি।

কি কথার উত্তর দিচ্ছ না যে?

আমার কোন আপত্তি নেই। রত্নাবলীর গালে একটা চুমু দিল রাজসিংহ, তবে ভেবে-টেবে দেখ। শেষ কালে আমাকে দোষ দিতে পারবে না।

কি রকম যেন ভয় পেয়ে চুপ করে করে রইল রত্নাবলী।

আর একটা কথা। প্রশ্নটা পাশার দানের মতো ছুঁড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল রাজসিংহ।

কী? অনেকক্ষণ পরে অস্ফুট শব্দ করে রত্নাবলী।

আমাকে কিন্তু কোনদিন ছেড়ে যেতে পারবে না।

এ কথারও উত্তর দিতে পারে না রত্নাবলী।

আমার সঙ্গে যাবার আগে আমাকে কথা দিতে হবে। উত্তরের জন্যে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে রাজসিংহ বলল, কী কথা বলছ না যে?

রত্নাবলী ফিসফিস করে বলে, সব কথার উত্তর আগে থেকে দেওয়া যায় না আর দেওয়া উচিতও নয়।

পুষি! রত্নবলীকে রাজসিংহ হঠাৎ পুষি বলে ডাকে,—তুমি দেখছি বড্ড চালাক, তাই না?

চালাকি দেখলে কাসে?

সে কথা পরে হবে। সত্যি কী তুমি আমার সঙ্গে যেতে চাও—

হ্যাঁ, এখান থেকে বের হতে চাই—

তা'হলে তৈরি হয়ে নাও। বেশি করা যাবে না—

তৈরি হবার কিছু নেই। শুধু কাপড়টা পালটে নেব।

তোমার গয়না-পত্তর এখানে ফেলে যাবে নাকি ?

সে সব তোমার দাদার কাছে—

তা' হলে তো ভালোই। বি রেডি দেন্। আমাকে দাদার একটা জামা-প্যান্ট দাও তো ভিজেগুলো ছেড়ে ফেলি! হাতঘড়িতে একবার চোখ ফেলল রাজসিংহ, রাস্তায় দাঁড়ালে শেষ বাসটা পেয়ে যাব। তাড়াতাড়ি করো বৌদি—

রাজসিংহর হাত ধরে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল রত্নাবলী।

বাসও পেয়ে গেল তারা।

স্টেশনে পৌঁছে দেখা গেল সকাল দশটার আগে কলকাতার কোন গাড়ি নেই।

তা' হলে ?

বৌদি তুমি তাহলে ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে রাতটা কাটাও। আমি বাইরে পাহারায় থাকি।

তুমি ঘুমুবে না ?

তোমাকে সঙ্গে নিয়ে পালাচ্ছি, এ উত্তেজনায় আমার ঘুম আসবে না। তার থেকে বাইরে বসে সিগারেট ফুঁকি।

স্টেশন মাস্টারকে ডেকে রত্নাবলীর শোবার ব্যবস্থা করে রাজসিংহ বলল, বৌদি তুমি দরজা বন্ধ করে দাও। দরকার হলেই ডাকবে। আমি বাইরে রইলাম—

আচ্ছা।

একলা শুতে তোমার ভয়-টয় করবে না তো ?

মোটেই না।

তুমি বরং আলোটা জ্বেলে রেখো।

সেই ভালো ঠাকুরপো।

রাজসিংহর মুখের উপর দরজা দিয়ে দিল রত্নাবলী

একটু বেলায় দরজায় ধাক্কাধাক্কিতে রত্নাবলীর ঘুম ভেঙে গেল। অনেক বেলা হয়ে গেছে। প্রথম দিকটা ভয়ে-ভাবনায় ঘুম আসেনি। ভোরবেলা কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল রত্নাবলী।

সকালের আলো তার চোখে লজ্জার মতো বিছিয়ে গেল।

দরজা খুলে দেখে মৃগাঙ্ক দাঁড়িয়ে আছে। চমকে উঠল রত্নাবলী।

রত্নাবলীকে দেখে ছুটে এল মৃগাঙ্ক, তোমার কী মাথা খারাপ হয়েছে! রত্নাবলী বুঝে উঠতে পারে না মৃগাঙ্ক কিভাবে স্টেশনে এসে হাজির হল। সম্ভবতঃ রাজসিংহ ফার্ম হাউসে গিয়ে মৃগাঙ্ককে খবর দিয়েছে। কী বলেছে কে জানে! কাল রাতের ব্যাপারটা তার কাছে কী রকম যেন স্বপ্নের মতো মনে হয়। উত্তর না দিয়ে গুম হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রত্নাবলী।

এখনো তো রাগ পড়েনি!

রত্নাবলী মাথা নিচু করে কী ভাবে সেই জানে।

কী সাংঘাতিক মেয়ে তুমি! আলতো গলায় কথা বলে মৃগাঙ্ক, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এমন কত হয়! এমন সব সামান্য ব্যাপার নিয়ে— ছিঃ-ছিঃ—

সামান্য ব্যাপার! কথা বলতে গিয়ে রত্নাবলীর চোখ দুটো ছোট হয়ে আসে।

চলো, গাড়ি এনেছি! বাড়ি গিয়ে ঝগড়া-ঝাঁটি যা করবার করো।

ভাগ্যিস রাজসিংহ তোমার দেখা পেয়েছিল—

ঠাকুর-পো কোথায়?

তার কথা আর বলো না। স্টেশন থেকে প্রথম বাসে গিয়ে আমাকে খবরটা দিল। সারারাত ঘুমোতে পারি নি। এ রকম দুশ্চিন্তায় মানুষ ঘুমোতে পারে না কি!

রাজসিংহ কি বলল, তোমাকে? এবার একটু কৌতূহলী হয় রত্নাবলী।

কী আর বলবে! বলল, কাল সন্ধেবেলা ফার্ম হাউসে কাউকে দেখতে না পেয়ে ভাবল, আমরা কোথাও বেড়াতে বেরিয়েছি। বৃষ্টির জন্যে ফিরতে দেরি হচ্ছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে শেষ বাসে করে স্টেশনে এসে দেখে, কলকাতায় যাবার ট্রেনের জন্যে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছ। তোমাকে কোন রকমে ওয়েটিং রুমে ঢুকিয়ে সারা রাত পাহারা দিয়েছে, তারপর স্টেশন থেকে প্রথম যে বাসটা ছাড়ে সেই বাসে করে গিয়ে আমাকে খবর দিয়ে বলল, মেজদা তুমি এক্ষুণি বেরিয়ে পড়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, রত্নাবলী কোন ট্রেনে যদি এর আগে উঠে পড়ে?

রাজসিংহ বলল, ভিলাই লোকাল পাঁচটার আগে বেরিয়ে গেছে। দশটার আগে কোন ট্রেন নেই। তারপর গাড়িতে তুলে দিয়ে বলল, দেরি করো না মেজদা—

জিজ্ঞাসা করলাম, তুই যাবি না?

সে বলল, আমাকে এখুনি একবার রায়পুর যেতে হবে। সেখান থেকে কলকাতা। যদি পারি যাবার আগে তোমাদের সঙ্গে দেখা করে যাব। আকাশের দিকে তাকিয়ে মৃগাঙ্ক বলল, তাড়াতাড়ি চলো। ফসল কাটবার লোক আসবে সকালে। কাল পথের মাঝখানে গাড়িটা খারাপ হয়ে যতো বিপত্তি, নাও চলো—

আজ আকাশের কোথাও মেঘ নেই। সূর্য উঠছে নাম-না-জানা কোন পাহাড়ের ওপার থেকে।

রত্নাবলী মৃদুকণ্ঠে বলল, চলো—। পা বাড়িয়ে মনে হল, স্বপ্ন দিনের বেলায় এতটুকু মানায় না। রাজসিংহর মুখটাও বুঝি স্বপ্নের মতো দিনের আকাশ থেকে মুছে গেছে।

--